একতলা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৬০

দ্বিতীয় সংস্করণ—ভাদ্র ১৩৬১

তৃতীয় সংস্করণ—ভাদ্র ১৩৬৬

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—শ্রীভোলানাথ হাজরা

রূপবাণী প্রেস

৩১, বাদুড়বাগান স্ট্রীট

কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদপট—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দু টাকা পঞ্চাশ ন. প

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু—

BUBNOV : Wake with a groan, sleep with a moan—that's the way we live......

LUKA : It's human beings we are, all of us. No matter what airs we put on, no matter how we make believe, it's human beings we were born, and it's human beings we'll die......and people are getting wiser, the way I see it, and more interesting...The worse they live, the better they want to live...A stubborn lot, human beings !

—Lower Depths

এই লেখকের অন্যান্য বই

তিমির তীর্থ (৩য় সং)

স্বর্ণ-সীতা (৬ষ্ঠ সং)

সূর্যসারথি (৫ম সং)

বৈতালিক (৩য় সং)

শিলালিপি (৩য় সং)

অসিধারা (২য় সং)

রামমোহন

শ্রেষ্ঠ গল্প (৩য় সং)

বাংলা গল্প বিচিত্রা

এক

'দেবি সুরেশ্বরি, ভগবতি গঙ্গে'—

শীতের রাত্রির সাড়ে চারটে। শিশিরে, কুয়াশায় আর ঠাণ্ডায় পৃথিবী কবরের মতো আড়ষ্ট। কম্বলের নিভৃত আরামের মধ্যে ঘুমটা নিটোল নিবিড় হয়ে আছে। পাশের ঘরে বড় ঘড়িটার টকাটক আওয়াজ ছাড়া কোনো শব্দ নেই কোথাও ; একটা কুকুর ডাকছে না, হড়মড়িয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে না একটা ধাড়ী ইঁদুর।

'ত্রিভুবন-তারিণী তরল-তরঙ্গে'—

বেসুরো তীক্ষ্ণ গলায় গঙ্গাস্তোত্র ঘুমটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিলে। জড়ানো চোখদুটো বিরক্তভাবে মেলে চারদিকে তাকালো কনকেন্দু। না, সে ছাড়া আর কারোর সুখনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটেনি বিন্দুমাত্রও। হলের মতো লম্বা ঘরটার মেঝেতে বাকী চারটি 'রুম মেট' তেমনি লেপ-কম্বলের তলায় নিশ্চিন্ত-নিদ্রিত। ওদের এসব অভ্যেস হয়ে গেছে।

'শঙ্কর-মৌলি-বিহারিণী বিমলে'—

এবার তারস্বরে চিৎকার—একেবারে ওদের বাড়ির সামনেই। শেষ রাত্রে ভক্তিভরে গঙ্গাস্নান করতে চলেছে, তাই যাক ; গঙ্গার মহিমা কীর্তন করছে—তাও করুক। কিন্তু অমন গলা চড়িয়ে হাঁকডাক কেন ? গঙ্গা কি কানে খাটো যে অমন প্রলয়ঙ্কর হুঙ্কার না ছাড়লে তিনি শুনতে পাবেন না ভক্তের আহ্বান ?

বিরক্তিতে খানিকক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে রইল কনকেন্দু। ভক্তি যাই থাক, এ সময়ে অমন করে চ্যাঁচানোর দুটি বাস্তব কারণ আছে বলে মনে হচ্ছে। গঙ্গাস্নানে যখন চলেছে তখন নিশ্চয়ই খালি গায়ে এবং খালি পায়ে ; বাইরের ঠাণ্ডাটা হাড়-পাঁজরে জানান দিচ্ছে তার অস্তিত্ব। অতএব ওই রকম গর্জন করে শরীরটাকে গরম রাখার চেষ্টা চলেছে। তা ছাড়া এই পথ দিয়েই মহাপ্রস্থানের যাত্রীরা যায় কাশী মিত্র ঘাটের উদ্দেশে। দুধারের অন্ধকার-স্তব্ধ বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে লোকটার ভয় ধরেছে কিনা—তাই বা কে বলবে !

কিন্তু সে যাই হোক, কনকেন্দুর ঘুমের দফা একেবারে শেষ করে দিয়ে গেল। কাল দেড়টার আগে চোখ বুজতে পারেনি—সবে যখন শেষ রাতে ঘুমটা জমাট বাঁধছে তখন এই গঙ্গাস্তোত্রের উৎপাত! ইতি করে দিলে ঘুমের সামান্য আশাটুকুরও। অসময়ে একবার জেগে গেলে সে আর কিছুতেই ভাঙা ঘুমে জোড়া লাগাতে পারে না; লাভের মধ্যে সারাদিন জ্বালা করতে থাকে চোখের পাতা, ঝিমঝিম করতে থাকে মাথার ভেতরে।

শোভাবাজার স্ট্রীটের নিথর ঘরবাড়ি আর শূন্য পাটগুদামগুলিতে কর্কশ শব্দতরঙ্গের আঘাত দিয়ে লোকটা চলে গেল রথতলা ঘাটের দিকে। আর ক্ষুব্ধ কনকেন্দু ভাবতে লাগল, অগত্যা এইবার সেও উঠে পড়বে কিনা।

কিন্তু উঠে ঘরময় চলাফেরা করলেও হয়তো অন্য মানুষগুলোর ঘুমের ব্যাঘাত হবে। সর্বজনীন লাইটটি জ্বাললে তো কথাই নেই—এক সঙ্গে সবাই উঠবে খ্যাচ্ খ্যাচ্ করে।

—ও মশাই, শান্তিতে একটু ঘুমুতেও দেবেন না নাকি?

—যখন-তখন অত আলো জ্বাললে ইলেকট্রিকের বিলটা কে দেবে দাদা? আপনি?

—নেভান—নেভান—আলো নেভান—

একমাত্র বাইরে বেরিয়ে গিয়ে খানিকটা প্রাতভ্রমণ করা চলে। কিন্তু এই অন্ধকারে—এই আড়ষ্ট ঝাপসা ঠাণ্ডায়? অন্তত সেদিক থেকে তো আদর্শ রাস্তা নয় শোভাবাজার স্ট্রীট। আর যেতে হলেও স্ট্র্যাণ্ডের রেল লাইন পেরিয়ে গঙ্গার ধারে। সেখানে গঙ্গার কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসটা খুব প্রীতিকর হবে বলে মনে হচ্ছে না। তা ছাড়া স্নানে যাওয়ার আগেই অমন খোলতাই সুরে যে গঙ্গা-স্তব জুড়েছে—ঠাণ্ডা কালো জলে একটা ডুব দেওয়ার পরে তার স্বর কী পরিমাণে গগনভেদী হয়ে উঠবে, আগে থেকেই অনুমান করা যাচ্ছে সেটা।

আরো একটা অসুবিধে আছে। নিচের তলায় সদর দরজায় মস্ত একটা লোহার তালা ঝুলছে। সেটা খোলাতে গেলে হাঁকাহাঁকি করে জাগাতে হবে একতলার উড়িয়া বাসিন্দাদের। চাবিটা তাদের কাছেই থাকে; কিন্তু এই

ভোরবেলাতেই মধুর কণ্ঠে 'শড়া' সম্ভাষণ শুনে দিনটা শুরু করার প্রবৃত্তি হয় না তার।

একবার বারান্দায় গিয়ে অবশ্য দাঁড়ানো চলে। সেটাই সব চাইতে নির্ঝঞ্ঝাট।

কিন্তু এই অন্ধকারে সেখানেও ঘটি-বালতি আর তোলা-উনুনে হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা আছে। অতএব—

অতএব আরো কিছুক্ষণ চোখ বুজে পড়ে থাকার সাধনাই করা যাক্।

কিন্তু বিছানায় পড়ে থাকলেই মন পড়ে থাকে না। একটার পর একটা চিন্তা এসে দাঁড়াতে লাগল মাথার মধ্যে। প্রকৃতির নিয়মে কোথাও ফাঁক থাকবার উপায় নেই।

মফঃস্বলের কলেজ থেকে বি-এ পাশ করে পড়তে এসেছে কনকেন্দু—যেমন করে হোক তাকে সংগ্রহ করতেই হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ডিগ্রিটা। প্রায় অচেনা কলকাতায় এসে প্রথম সে আশ্রয় নিয়েছিল দক্ষিণ কলকাতায়—সুখী সচ্ছল আত্মীয়ের বাড়িতে। সেখানে তার স্থানাভাব হত না—যাঁদের বাড়ি, তাঁদেরও হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

কিন্তু বাড়িতে জায়গা থাকলেও, মনের দিক থেকে জায়গা মিলল না। মুখে কিছু বলবার দরকার ছিল না, কয়েকটা আভাস-ইঙ্গিতই যথেষ্ট হল কনকেন্দুর পক্ষে।

তৃতীয় পক্ষ চতুর্থ পক্ষকে বলে। কিন্তু লক্ষ্যভেদ করে যথাস্থানেই।

—কাল মজুমদার বলছিল, ভারি অসুবিধেয় পড়েছে। স্বামী-স্ত্রী একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে—সেখানে দেশ থেকে একদল আত্মীয় এসেছে কালীঘাট দেখবার জন্যে। কদিন আবার থাকবে কে জানে! বেচারী ভাবছে, স্ত্রীকে ভবানীপুরে দাদার বাড়িতে পাঠিয়ে নিজে গিয়ে হোটেলে উঠবে। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো!

—কলকাতায় বাসা করে থাকার লাভই এই। আত্মীয়েরা একেবারে বর্গীর মতো হানা দিতে আরম্ভ করে। কেউ আসবেন তীর্থদর্শনে। কেউ আসবেন মেয়ের বিয়ের পাত্রের সন্ধানে। কেউ আসবেন চোখের ছানি

কাটাবে, আর কেউ বা হাজির হবেন সিনেমা দেখতে। আর চাকরীর খোঁজে যিনি আসবেন, তাঁর তো মৌরসী পাট্টা। কলকাতায় বাসা করা আর ধর্মশালা খুলে দেওয়া একই কথা!

তিন চারদিন সংকোচে মরে রইল কনকেন্দু। পালাতে পারলে বাঁচে এখান থেকে। কিন্তু যাবে কোথায়? কলকাতা তার অচেনা—পকেটের সম্বল সবশুদ্ধু বারো টাকার বেশি নয়।

এমন সময় ভবঘুরে এক জ্ঞাতি দাদাকে মনে পড়ল। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার উদ্দেশ্যে ভদ্রলোক আর বি-এ পরীক্ষা দিলেন না, দিন কয়েক জেল খেটে এসে আরম্ভ করলেন আলুর ব্যবসা। ব্যবসা দুদিনেই ফেল পড়ল ; কিছু আলু ইঁদুরে খেল, কিছু গেল ধাপার মাঠে। কিন্তু হীরেনদা দমলেন না। ঝোলাগুড়ের ব্যবসায় আরো কিছু লোকসান দিয়ে তিনি ঝুলে পড়লেন ফাটকা বাজারে। ক্লাইভ স্ট্রীটের একটি নিভৃত অংশে যেখানে কয়েকটি টেলিফোন মারফৎ শেয়ারের জুয়াখেলা চলেছে—হীরেনদা সেখানেই গিয়ে হাজির হলেন লক্ষ্মীলাভের সন্ধানে। পাঞ্জাব-সিন্ধু-মাড়োয়ার-গুর্জরের সঙ্গে উড়ুক্কু মাছ ধরবার প্রতিযোগিতায়।

কতদূর কী রোজগার করছেন হীরেনদাই জানেন। কিন্তু শোভাবাজারের একটা মেসে তিনি থাকতেন কনকেন্দুর জানা ছিল সেটা—ঠিকানাও মনে ছিল।

বালিগঞ্জের বাক্যবাণ দুঃসহ। অগত্যা সকালে উঠেই একদিন বেরিয়ে পড়ল হীরেনদার খোঁজে।

কিন্তু কোথায় শোভাবাজার স্ট্রীট?

বাসের একজন সহযাত্রী বললেন, আপার চিৎপুর আর হ্যারিসন রোড পেরুলেই শোভাবাজার।—বলে ভদ্রলোক নেমে গেলেন ভবানীপুরে।

হ্যারিসন রোডের মোড়ে নেমে কনকেন্দু হাঁটতে আরম্ভ করলে। কিন্তু কোথায় শোভাবাজার? নিরুপায় হয়ে প্রশ্ন করলে পাহারাওয়ালাকে।

পাহারাওয়ালা একটা হালুয়াই দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে উপরি-পাওনা লাড্ডু চিবোচ্ছিল গোটাকয়েক। প্রশ্ন শুনে ভরাট মুখে পাল্টা জিজ্ঞাসা করলে, আপ্ সোনাগাছি-রামবাগান জানতে হেঁ?

বলে কী! কলকাতা চেনা নেই বটে, কিন্তু সোনাগাছি-রামবাগানের খ্যাতি কানে এসেছে বহুদিন আগেই। লোকটা শেষকালে তাকে ওই অঞ্চলের যাত্রী ঠাওরাল নাকি? কী ভয়ঙ্কর!

পাহারাওয়ালা বললে, সোনাগাছি যাইয়ে—

—অ্যাঁ!

—হাঁ—হাঁ, যাইয়েনা!—

পাহারাওলা এবার এক ঠোঙা ফুচ্‌কার ভেতরে মনোনিবেশ করলে।

কনকেন্দু আর দাঁড়াল না। বিশ্বাস নেই পুলিশকে। পরোপকারের বাসনা জেগে উঠলে হয়তো পাঁজাকোলা করেই রামবাগানে পৌঁছে দেবে। শাস্ত্র মতে শত হস্তই ভালো—এগিয়ে চলল দ্রুত পায়ে।

শোভাবাজার পাওয়া গেল আরো আধ ঘণ্টা হাঁটবার পরে। তারপরে বাড়িটা খুঁজে পেতেও খুব দেরী হল না। কিন্তু এ কী বাড়ি! আকারে প্রকাণ্ড বটে, কিন্তু জীর্ণতায় এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে এখন হুড়মুড় করে পড়বার অপেক্ষামাত্র। নিচে একটা চায়ের দোকানে প্রকাণ্ড এক হাঁড়ি বড় মটর সেদ্ধ হচ্ছে—বাড়ির সামনে আট দশটি উড়িয়া ঝগড়া করছে প্রাণপণে। 'তু মরিবু—তু মরিবু! ধাঁই কিড়ি ওলাউঠায় মরিবু!'

সর্বনাশ! কনকেন্দু সভয়ে চা-ওলাকেই জিজ্ঞাসা করলে, এ বাড়িতে হীরেন ঘোষাল থাকেন?

লোকটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে কনকেন্দুর দিকে তাকালো। খালি গা। চামড়াগুলো কোঁচ্‌কানো, মাথার চুল ধূসর আর শাদায় একাকার—তুটো শূন্যপ্রায় মাড়িতে সবশুদ্ধ গোটাচারেক হলদে রঙের বড় বড় দাঁত। লাল টকটকে চোখ মেলে এমন করে চেয়ে রইল যেন কথাটা সে শুনতেই পায়নি।

নিজের অজ্ঞাতেই এক পা পিছু হটল কনকেন্দু। জড়ানো গলায় আবার বললে, এ বাড়িতে হীরেন ঘোষাল থাকেন কিনা বলতে পারেন?

চা-ওলা আচমকা হেসে উঠল হা-হা করে। খানিকটা থুথু ছিটকে বেরুল মুখ দিয়ে। দাঁত চারটে নয়—একুনে তিনটে।

—ওপরে তো হরি ঘোষের গোয়াল মশাই! হীরেন—হরেন—নরেন—

বয়েস—যা চান সব আছে। কলকাতায় যত গোরু হারায়, সব এসে জমা হয় এই খোঁয়াড়ে। ওই ওধারেই সিঁড়ি রয়েছে, সোজা উঠে যান ওপরে। দেখবেন একেবারে সুলতান খাঁর চ্যাটাই বিছিয়ে লম্বা হয়ে পড়ে আছে সব। যান, যান—ওপরে যান—

নার্ভাস কনকেন্দু আরো নার্ভাস হয়ে সিঁড়ির দিকে এগোলো।

উল্টো 'দ'য়ের মতো খোলা সিঁড়ি। এক ধারে পানের পিকচর্চিত শ্যাওলাধরা কানা দেওয়াল, আর একদিকে ভাঙা রেলিঙের বিপজ্জনক ফাঁদ। পিছল সিঁড়ি জল-কাদায় একাকার। ভাঙা রেলিঙের ওপর নজর রেখে পা টিপে টিপে উঠতে হল ওপরে। কাদার মধ্যে চিৎ হয়ে পড়ে পা নেড়ে নেড়ে বোধ হয় সূর্য-প্রণাম করছিল একটা আরশোলা—চেপ্টে গেল জুতোর তলায়।

ওপরে দেড়হাত বারান্দার পাশ দিয়ে লম্বা ঘরের সারি থার্ড ব্র্যাকেটের মতো দুদিকে বেঁকে গেছে। তারি একখানায় আবিষ্কার করা গেল হীরেনদাকে। নগ্ন মেজের ওপর চার পাঁচটা সতরঞ্চের বিছানা গোটানো—যেন যাত্রার দল আশ্রয় নিয়েছে নাটমন্দিরে। আজ রবিবার—ঘরের একধারে নানা রঙের লুঙ্গিপরা জন কয়েক লোক বসে টুয়েন্টি নাইন খেলছে। হীরেনদা সে-দলে নেই। বাঘের ছবি আঁকা ময়লা একখানা ছেঁড়া মাদুরে বসে তিনি গভীর মনোযোগে খবরের কাগজ পড়ছেন।

ঘরে ঢুকবে কিনা—দ্বিধা করতে লাগল কনকেন্দু। কিন্তু হীরেনদাই মুখ তুললেন। সগর্বে কাকে বলতে গেলেন, কেমন হে, আমি তখনি বলিনি যে হেশিয়ান আর বুলিয়ান মার্কেট—

কিন্তু ঠিক তখনি তিনি কনকেন্দুকে দেখতে পেলেন।

আর সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে জয়ধ্বনি করে উঠলেন হীরেনদা।

—আরে—কনক যে! তুই এখানে কোত্থেকে? কবে এলি কলকাতায়?

—দিন সাতেক।

—বলিস্ কী! আর এত দিন একেবারে নো পাত্তা! আয়, আয়—

ভেতরে আয়—বাঘ-আঁকা জাপানী মাদুরের খানিকটা ছেড়ে দিয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন হীরেনদা।

কনকেন্দু ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল, হঠাৎ হাঁ হাঁ করে আওয়াজ উঠল পেছন থেকে।

—জুতো খুলে দাদা, জুতো খুলে। ওই সাতরাজ্যি মাড়ানো কাদা নিয়ে আর ভেতরে ঢুকবেন না দয়া করে।

চমকে কনকেন্দু ফিরে তাকালো। কালো বেঁটে চেহারার এক ভদ্রলোক—স্নান করে এলেন এই মাত্র। মাথার কদমছাঁট ·চুল প্রায় ন্যাড়াত্বের পর্যায়ে। পরনে গেরুয়া—কাঁধে ভিজে গামছা। এক হাতে এক বাল্‌তি জল নিয়ে একটু হেলে দাঁড়িয়েছেন, ক্লান্তির নিঃশ্বাস পড়ছে অল্প অল্প। তাঁর ক্ষুদে মিটমিটে চোখে জ্বলন্ত ধিক্কার।

গেরুয়াধারী আবার বললেন, কি রকম লোক মশাই আপনি? কত কষ্টে ঘর-টর মুছে এই মাত্তর চান করতে গেছি। আর আপনি ওই জুতো শুদ্ধু পা—

হীরেনদা বিব্রত হয়ে উঠলেন: আহা-হা সাধু, চটছ কেন? ও আমার আত্মীয়—নতুন লোক। জানত না বলেই জুতো খুলতে ভুলে গিয়েছিল।

—ওঃ, আপনার আত্মীয়? তা একটু দেখে শুনে ঢুকলেই তো হয়!—বিরস মুখে জবাব দিয়ে সাধু ঘুরে রাস্তার দিকের বারান্দায় চলে গেল—রেলিংয়ের ওপর মেলে দিতে লাগল ভিজে গামছা।

হীরেনদা বললেন, আয় কনক—আয়—

ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু আর ফেরা যায় না এখন। পায়ের চটি খুলে রেখে সভয়ে কনকেন্দু ঘরে ঢুকল। তারপর সংক্ষেপে হীরেনদার পায়ের ধুলো নিয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে পড়ল ছেঁড়া জাপানী মাদুরের সংকীর্ণতম অংশটুকুতে।

যারা টুয়েন্‌টি নাইন খেলছিল, তাদের একজন সশব্দে গোলাম মারল। তারপর আনন্দে উবু হয়ে উঠে প্রাণপণে হাঁটু চুলকোতে চুলকোতে সোচ্ছ্বাসে বললে, কেমন, হল তো শালা? এবারে বার করো কালো সেট—হুঁ—হুঁ—

বিরক্ত মুখখানা ঘুরিয়ে নিলেন হীরেনদা। কেমন অপ্রস্তুত আর অপ্রতিভ

হয়ে গেছেন তিনি—লক্ষ্য করলে কনকেন্দু। আদর্শ ব্রহ্মচারী, পঁয়তাল্লিশ বছরের প্রৌঢ় হীরেনদা। এই মানুষগুলোর সঙ্গেই যে তিনি বাস করেন, কনকেন্দুর চোখে এটা ধরা না পড়লেই আরাম বোধ করতেন যেন।

হাওয়াটা ঘুরিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন: কোথেকে এলি এ সময়ে? উঠেছিস কোথায়?

সংক্ষেপে কৌতূহল মিটিয়ে সসংকোচে কনকেন্দু নিজের বক্তব্য পেশ করল: এদিকে কোথাও সস্তায় মেস্ পাওয়া যায় না হীরেনদা? আর দু একটা ছেলে পড়ানো?

—কেন, বেশ তো আছিস প্রভাতের বাড়িতে। ওরা বড়লোক—তোর কোনো কষ্ট হবে না।

—আমার নয়— ওঁদের বোধ হয় কষ্ট হচ্ছে—অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথাটা বেরিয়ে গেল।

হীরেনদা একটু চুপ করে রইলেন। বাইরে ভিজে গামছা মেলে দিয়ে সাধু তখন ঘরে এসে ঢুকেছে, এক কোণায় বসে বোধ হয় শুরু করেছে আহ্নিক। কিছুক্ষণ সেদিকে ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, হুঁ, বুঝেছি। হঠাৎ বড়লোক হয়ে গেছে কিনা—আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার করতেই লজ্জা পায়। সেটা আমিও টের পেয়েছি। পথে কতবার দেখা হয়েছে—মুখ ঘুরিয়ে চলে যায় —যেন চেনেইনি। কিন্তু সে যাক। তুই বরং থেকে যা এখানেই।

—এখানেই?—কনকেন্দু চমকে উঠল।

—দিব্যি জায়গা, বুঝলি?—হীরেনদার স্বরে হঠাৎ একরাশ উৎসাহ ঝরে পড়ল: সারা কলকাতার মধ্যে চীপেস্ট্। একটা মাদুর বিছিয়ে পড়ে থাক— এক টাকা সিটরেন্ট আর চার আনা ইলেকট্রিকের ভাড়া। নিচেই পাইস্ হোটেল আছে, পাঁচ পয়সাতেই দিব্যি খাওয়ায়।—হীরেনদা যেন প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করলেন: দু পয়সা ভাত, এক পয়সার ডাল আর দু পয়সায় মাছের ঝাল একটা—

উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে কনকেন্দু বললে, কিন্তু পড়ানো?

—বেশ হবে—খাসা হবে। এ বাড়িতে যাদের দেখছিস, তারা অনেকেই

বেশ রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল ।—হীরেনদা যেন এতক্ষণে নিজের সম্পর্কে একটা কৈফিয়ৎ দেবার সুযোগ পেয়েছেন : অন্য ঘরগুলোতে আরও দু তিনজন স্টুডেন্ট রয়েছে। একজন তো এ বছর এখান থেকেই এম-এ পাশ করল।

অকাট্য যুক্তি। তবু মন আশ্বস্ত হচ্ছে না। কনকেন্দু এদিক ওদিক তাকাতে লাগল।

হীরেনদা বলে চললেন, এ সময়ে এসেছিস, ভালোই করেছিস। পাশের ঘরে একটা সীট খালিও রয়েছে। আজই ব্যবস্থা করে দিই।

—কিন্তু একটা ট্যুশন তো চাই। ইউনিভার্সিটিতে অবশ্যি ফ্রী পাব—বি-এর রেজাল্টটা ভালোই রয়েছে আমার। কিন্তু অন্যান্য খরচ—

—হবে—হবে, সব হবে।—যেন সব কিছুর সমাধান হয়ে গেছে এমনি আশ্বস্ত ভঙ্গিতে হীরেনদা বললেন, আমার কাছে এসেছিস, জলে তো আর পড়িসনি। এবেলা খেয়ে-দেয়ে আমার এখানেই গড়া—বিকেলে বালিগঞ্জ থেকে বিছানাপত্তর নিয়ে আসবি।

কনকেন্দু বিমর্ষ হয়ে রইল।

হীরেনদা বললেন, আরে, পড়ার ইচ্ছে থাকলে গ্যাসলাইটের নিচে বসেও হয়। আর বারো-চৌদ্দ টাকা দিয়ে পটলডাঙার কোনো মেসে উঠলেই কি সুবিধে হত? সেখানেও তো দু তিন জনের সঙ্গে এক ঘরেই থাকতে হবে। তা ছাড়া ওখানে বাঁধা খরচ—এখানে ইচ্ছেমতো টাকা বাঁচাতে পারবি। এই ধর না—একদিন গা একটু ম্যাজ ম্যাজ করল—উড়ের দোকান থেকে দু পয়সার রুটি কিনেই চালিয়ে দিলি! এক হাতা ছোলার ডাল ফ্রী দেবে—হীরেনদার চোখ হঠাৎ চক চক করে উঠল : আর ডালটা ওরা করেও ভালো। আর যদি এক পয়সার ফুলুরি কিনে নিতে পারিস—তবে তো হেভেন!

ভবিষ্যতের ছবিটা মন্দ নয়। কনকেন্দু অনুধাবন করবার চেষ্টা করতে লাগল।

তারপর গলা নামিয়ে হীরেনদা ফিস্‌ ফিস্‌ করে বললেন, মানে সর্বসাকুল্যে তো গোটা পাঁচেক টাকার মামলা! একরকম চলেই যাবে—ভাবিসনি।

এক মুহূর্তে দোল খেয়ে গেল কনকেন্দুর মন। বালিগঞ্জের ঝকঝকে

তেতলা বাড়ি—সাত আট খানা ঘর, চকচকে একখানা মোটর। তবু সেখানে জায়গা হল না। আর এখানে হীরেনদার ভাঙা তোবড়ানো গাল, মুখে তিন দিনের না-কামানো দাড়ি আর ছেঁড়া ময়লা বিছানাতেও তার জন্যে সাদর আমন্ত্রণ মেলা রয়েছে। বালিগঞ্জে এক কলকাতা—এখানে আর এক কলকাতা। এখানে এক কম্বলেই সাতজন ফকিরের জায়গা কুলিয়ে যায়!

হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল কনকেন্দু: সেই ভালো—আমি এখানেই থাকব।

টুয়েন্‌টি নাইনের আড্ডায় প্রচণ্ড বেগে তুরুপ্ পড়ল একখানা। আহ্নিক শেষ করে মচ্ মচ্ শব্দে সাধু তখন এক থাবা ভিজে ছোলা চিবোতে আরম্ভ করেছে। কদম ছাঁটা চুলগুলোর ভেতর থেকে টুকটুক করে ছাগলের ল্যাজের মতো টিকি নড়ছে একটা।

—হরি হে, তুমিই ভরসা!

কনকেন্দুর চটকা ভাঙল। তিনমাস পেছন থেকে চেতনা ফিরে এল শীতে-জর্জরিত প্রায়ান্ধকার ঘরটার মধ্যে। পাশের সীটের, অথবা পাশের সতরঞ্চির গোকুলবাবুর ঘুম ভাঙল।

গা থেকে লেপ সরিয়ে গোকুলবাবু উঠে বসলেন। হাই তুললেন শব্দ করে—পট পট করে গোটা-দুই তুড়ি মারলেন মুখের সামনে। দাঁড়িয়ে উঠে লুঙ্গির কষিটা শক্ত করে বাঁধলেন, একটা নমস্কার করলেন দেওয়ালে লম্বিত তাঁর গুরুদেবের ছবির উদ্দেশে।

তারপর জড়ানো করুণ স্বরে ডাকলেন: অ নকুল—নকুল রে—

কনকেন্দুর আর একপাশে একটা ধূসো কালো কম্বলের তলায় নকুল নড়ে উঠল একবার। গোকুলবাবুর ছোট ভাই। কিন্তু মানুষটা একটু আয়েসী—দাদার মতো প্রাতরুত্থানটা সে পছন্দ করেনা—আরো বিশেষ করে এই শীতের সকালে।

—নকুল, অ রে নকুল—

বিড় বিড় করে কী একটা বলে নকুল পাশ ফিরল। যেন অস্ফুটভাবে শুনতে পাওয়া গেল : ধুত্তোর!

কনকেন্দু হেসে উঠল : এই সকালে আর বেচারাকে বিরক্ত করছেন কেন গোকুলবাবু? ঘুমুতে দিন আর একটু। শীতটাও তো বেশ চড়া আজকে।

আবছা অন্ধকারেও দেখা গেল একটা কোমল হাসিতে আকীর্ণ হয়ে উঠল গোকুলবাবুর মুখ : জাইগ্‌লেননি কনকবাবু? এত সকালেই ঘুম ভাইঙছে আপনার?

এবার কনকেন্দুও উঠে বসল।

—হ্যাঁ, আপনাদের মতোই ভোরে ওঠা অভ্যাস করছি।

গোকুলবাবু সুইচ টিপে আলো জাললেন। সেই আলোয় দেখা গেল, তাঁর ছোটখাটো গোলগাল মুখখানা কেমন একটা সস্নেহ সমবেদনায় স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। ভদ্রলোক মহিলা হলে পাড়ার ছেলেরা ঘুড়ি কেনবার পয়সা চাইত ওঁর কাছে, নাম দিত মাসিমা।

—আমরা হইলাম মূর্খ—কুলি মজুর। আমাগোরনি গায়ে খাইট্যা পয়সা কামাইতে হয়। আপনারা হইলেন এস্‌স্টুডেণ্ট—দেশের জুইয়েল্ (জুয়েল)। আপনারা ক্যান কষ্ট কইরবেন আমাদের মতন?

নির্বিরোধ নিরীহ মানুষ গোকুলবাবু—দু ভাই-ই তাঁরা গেঞ্জীর কলে 'ফিটারের' কাজ করেন। নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। লেখাপড়া বিশেষ শিখতে পারেননি বলে যেন মরমে মরে থাকেন সব সময়ে। তাই কলেজের ছাত্রদের সম্বন্ধে তাঁর অসীম শ্রদ্ধা, তাদের প্রত্যেককেই এক একটি জুয়েল মনে করেন তিনি। কিন্তু তাদের ভেতরে কতগুলো যে ঝুটা মোতি—সে খবর ভালো করে জানাও নেই সাদাসিদে গোকুলবাবুর।

কিন্তু গেঞ্জীর কলে চাকরী করে—দারিদ্র্য আর দীনতার সঙ্গে লড়াই করে, তবুও আশ্চর্য স্নেহপ্রবণ তাঁর মন। কোথায় একটা কোমল নারীহৃদয় আছে তাঁর ভেতরে—কনকেন্দু তার একটা নরম ছোঁয়া সব সময় অনুভব করতে পারে। এই সস্নেহ উচ্ছ্বাসটার ঠিক জবাব কী দেওয়া যায়, সে ভেবে পেল না।

—শুইয়া পড়েন—শুইয়া পড়েন—গোকুলবাবু আবার বললেন।

—আঃ, এখন আর শোবোনা।

—এই দ্যাখেন—গোকুলবাবু আবার মুগ্ধভাবে বললেন, আপনারা এস্‌ট্যুডেন্ট—সময়ের 'ভেলু' বুইঝতে পারেন। আর নকুলভারে ছাখেন—কোনোদিন নি উয়ার বুদ্ধি-বিবেচনা হইবো? আমি অরে কই—নোকলা—কনকবাবুরে দেইখ্যা শিক্ষা কর!

—অতটা বাড়াবেন না গোকুলবাবু—আমি অমন আদর্শ ব্যক্তি নই!

—কী যে কন্—পণ্ডিত মানুষ আপনারা!—গোকুলবাবু সবিনয়ে বললেন, আপনাদের কথা শুইন্‌লেও পুণ্য হয়। অরে অ নকুল, উইঠ্‌ছস্‌নিরে?

নকুল আর থাকতে পারল না। পরম বিরক্তিভরে উঠে বসল।

—কী হইল? এত ডাকেন ক্যান?

—সাড়ে পাঁচটা বাজলরে নকুল! ঠাকুরের নাম করা হইবো না?

নকুলের কপালে একটা ক্ষীণ ভ্রূকুটি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। গোকুলবাবু ততক্ষণে বারান্দা থেকে একটা বালতি আর গামছা নিয়ে রওনা হয়েছেন একতলার কলের দিকে। ব্যাজার মুখ করে অত্যন্ত মন্থর পায়ে তাঁর পিছে পিছে নকুল বেরিয়ে পড়ল। মৃদু কণ্ঠে সে যা আওড়াচ্ছিল, তা অন্তত ইষ্ট নাম নয়!

ঘরের অন্য প্রান্তে ওভারশিয়ার সুদাম পাল উঁ উঁ করে উঠল।

—আবার নাকের ডগায় লাইটটা জ্বেলে দিয়ে গেল! একটু ঘুমুতেও দেবে না!

—আমি নিবিয়ে দিচ্ছি—কনকেন্দু উঠে গিয়ে আলোটা অফ করে দিলে, তারপর চাদরটা গায়ে টেনে নিয়ে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো।

নিচে শোভাবাজার স্ট্রীট, ভোরের আলোয় শাদা হয়ে এসেছে। রুদ্ধদ্বার বাড়িগুলোর কবাট খুলছে একটা একটা করে—রথতলা ঘাটের পথ বেয়ে স্নানার্থী স্নানার্থিনীদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। ঝর্ ঝর্ করে এখানে ওখানে ঝাঁটা ছুঁইয়ে কর্তব্য শেষ করছে কর্পোরেশনের ঝাড়ুদার। ওদিকে একটা গলি থেকে ঠুন্ ঠুন্ করে একখানা রিক্সা বেরুল—মরা গ্যাসের দীপ্তিতে তার ওপরে দেখা গেল একটি যাত্রীকে। উস্‌কো খুস্‌কো চুল—বসে বসে

ঢুলছে লোকটা। ওদিকটায় পতিতাপল্লী—তারি কোনো ঘরে রাত কাটিয়ে স্ফূর্তিতে অসাড় শরীর নিয়ে ভোরবেলায় ফিরে যাচ্ছে কোনো সীমন্তিনী স্ত্রী অথবা রত্নগর্ভা মায়ের কাছে।

ট্যাং ট্যাং করে কাঁসর বেজে উঠল—কোথাও মন্দিরে ভোরাই-আরতি শুরু হয়েছে। একটা লাল রঙের সাইকেলে দ্রুত বেগে যেতে যেতে হাঁক দিয়ে গেল খবরের কাগজের হকার—'অমৃৎবাজা—আ—আর—টেস্‌ম্যান্—ন্—'। সামনের বড় বাড়িটার তেতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালো তেরো-চৌদ্দ বছরের একটি কিশোরী মেয়ে, ঘুমজড়ানো চোখে চেয়ে রইল নিচের রাস্তার দিকে। মেলে-দেওয়া কালো চুলের রাশ আর নীলাম্বরীর পত্রপুটে তরুণ গৌর মুখখানিকে প্রথম ফোটা পদ্মের মতো মনে হল।

—বলো হরি, হরি বো—ও—ল্—

শান্ত রাস্তাটার ওপর এতক্ষণ যেন নিঃশব্দ গম্ভীর স্বরে ভৈরোঁর তান বাজছিল, হঠাৎ ঝনাৎ ঝনাৎ করে ভোরের সেতারে তার ছিঁড়ে গেল। না, মড়া যাচ্ছে না, পুড়িয়ে ঘাটের দিক থেকে ফিরে আসছে একদল। সব ক'টিই ছোকরা—বয়েস কুড়ি থেকে চব্বিশের মধ্যে। ওদের তীক্ষ্ণ আর উচ্ছল কথালাপ অনেকটা দূর থেকেই স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল। ভিজে কাপড়ের শীত কাটাতে চাইছে সশব্দ আত্মঘোষণায়!

—মাইরি, দেখলি বুড়োটার কাণ্ড? অমন সুন্দরী মেয়েটাকে বিয়ে করলে সেদিন, অথচ একমাস যেতে না যেতেই টেঁসে গেল!

—আহা-হা, চুক্ চুক্।—আর একজন স্বর টেনে ছড়া কাটল: বিবি যখন যৈবন পেলেন, মিঞা তখন গোরে গেলেন—

—বুড়োটা কী কেঠো ছিলরে! সারারাত ধরে পুড়লে—দু দণ্ড আগে যে বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে নেব, সে সুখটুকু অবধি দিলে না!

—হাঁরে হেবো, তোদের তো পাশের বাড়ি। বুড়ো তো লাইন-ক্লিয়ার করে দিলে, এইবেলা—

নাঃ, অসহ্য। বারান্দা থেকে কনকেন্দু সরে এল ঘরের ভেতর। একটা অশ্লীল অট্টহাসির সম্মিলিত আওয়াজ রাস্তা থেকে ভেসে এল দমকা বাতাসের

মতো। আশ্চর্য রকমের নোংরা আর নিষ্ঠুর মন! একটা মানুষকে সন্ত দাহ করে এসে কী করে এ ধরনের আলোচনা সম্ভব! অথবা—অথবা এই-ই হয়তো মানুষ। মৃত্যুকে ভয় করে বলেই তাকে অস্বীকার করতে চায় এমনি ভাবে। দেহের পরিণামকে ভুলতে চায় দেহলিপ্সার মাদকতায়।

ঘরের মধ্যে তখন গোকুলবাবু আর নকুলের বিছানা গোটানো শেষ হয়ে গেছে। দুজনেই জোড়াসনে বসেছেন গুরুদেবের ছবির সামনে, তারপর বেশ উঁচু গলাতেই বেসুরো বন্দনা সুরু করেছেন:

"গুরু হে, পাপের জ্বালায় জ্বলে মরি!
কাঙাল জনে করো দয়া—গুরু হে—
দাও হে তোমার চরণ-তরী—"

ওভারশিয়ার সুদাম পাল আর থাকতে পারল না। হতাশ হয়ে তড়াক করে উঠে বসল বিছানায়। তারপর বালিশের তলা থেকে একটা স্লিপওভার টেনে নিয়ে গায়ে চড়াতে চড়াতে কটু চাপা গলায় বললে, উঃ—রোজ সকাল বেলায় এই উৎপাত! যত সব বাঙালে কাণ্ড! জ্বালালে মাইরি!

ঘরের সর্বশেষ নিদ্রিত ব্যক্তি ক্যান্‌ভাসার যতীন পুতিতুণ্ডি এতক্ষণে নাক বের করলে লেপের তলা থেকে। বাটারফ্লাই গোঁফের নিচে একটুখানি মধুর হাসি হেসে বললে, অত বাঙাল-বাঙাল কইয়োনা ব্রাদার! পাশাপাশি বন্ধু-ভাবে আছি—মাতৃভূমির নিন্দা করলে হোম-ফ্রণ্টে ঘুষাঘুষি হইয়া যাইবো—কইয়া দিলাম! আর সারাদিন তো খালি অকাজ-কুকাজই করবা! বরং বিনা পয়সায় ধর্মকথা শুইন্যা লও—পরলোকে ইন্‌ভেস্ট্‌মেণ্ট হইবো।

"গুরু হে, দারা-পুত্র-পরিবার—
অন্তকালে কে-ই বা কার—
বাঁধে কেবল মায়ার ফাঁদে, গুরু হে
হাতে-পায়ে লাগায় দড়ি—"

—হুঁ!—সুদাম পাল বিরক্তিভরে মুখভঙ্গি করলে একটা, কিন্তু যতীন পুতিতুণ্ডিকে আর ঘাঁটাতে সাহস পাওয়া গেল না। যতীন এককালে ছোরা মারামারি করত—কপালে এখনো লম্বা একটা কাটার দাগ।

খাকি হাফপ্যান্টপরা বেঁটে মুগুরের মতো সুদাম পাল উঠে পড়ল। তারপর সেই গুরু কীর্তনের মধ্যেই আচমকা ঘরের মেঝেতে উবুড় হয়ে পড়ে হুস্‌হাস্‌ করে গোটা কয়েক বুক ডন দিতে শুরু করে দিলে। এটা সুদাম পালের দৈনন্দিন অভ্যাস—রোজ সকালে এমনি ব্যায়াম করে সে তার স্বাস্থ্য ভালো রাখতে চেষ্টা করে। তারপরে আছে মুগ ভেজানো আর আদার কুচি!

কনকেন্দু বিছানাটা জড়িয়ে ফেলল। তারপর টুথব্রাশ আর মগ্‌ নিয়ে বেরুল সর্বজনীন কলের উদ্দেশে। কিন্তু সিঁড়ির গোড়ায় আসতেই একটা প্রচণ্ড চিৎকারে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। নিচের মস্ত উঠোনটা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে এই মুহূর্তে। যুযুধান দুটি মানুষ দুটো ক্ষ্যাপা মোষের মতো ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে পরস্পরের ঘাড়ে। চারদিকের সমবেত উড়িয়া দর্শকদের মধ্য থেকে উঠছে আনন্দিত কলরব : নারদ অঅ—নারদ অ-অ—

লড়ছে পাইস্‌ হোটেলের মালিক শ্যামাদাস আর তার মামাতো ভাই কুঞ্জলাল। আর যে ভাষায় পরস্পরকে সম্ভাষণ করছে, তাতে আর যাই থাক, ভ্রাতৃত্বের কোনো ব্যঞ্জনাই নেই! আদিম গজ-কচ্ছপের আধুনিক সংস্করণ একটি।

—আয় শূয়োরের বাচ্চা—আয়—

—তুই এগিয়ে আয় হারামজাদা, দেখি তোর মুরোদ কত।

আটাত্তরের একের এ বাড়িতে দৈনন্দিন জীবন শুরু হয়ে গেছে। "প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ং'—

দুই

—দুর্গা—দুর্গা--কে একজন দর্শক মন্তব্য করলে।

ইতিমধ্যে শ্যামাদাস ঝাঁ করে একটা ঘুষি নামিয়ে দিলে কুঞ্জলালের নাকে। পা হড়কে কুঞ্জলাল বসে পড়ল—নাকটা রক্তে লাল—ঠোঁটের একটা কোণাও ফেটে গেল সেই সঙ্গে।

ঘটনাটা আর উপেক্ষা করা যায় না—এরপরে পুলিশ কেস্ পর্যন্ত গড়াবে এবং আটাত্তরের একের এর মানুষগুলো আর যাই করুক, আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে রাজী নয় কিছুতেই। হাঁ হাঁ করে চারদিকের লোক এইবারে দুজনের মাঝখানে গিয়ে পড়ল।

বাধাটা পড়েছিল সময়মতোই। কারণ নিজের রক্ত দেখে কুঞ্জলালের মাথার মধ্যে আগুন ধরে গিয়েছিল, চোখে খুন উঠেছিল চমক দিয়ে। এক পাশ থেকে উড়িয়াদের কয়লা ভাঙা একটা হাতুড়ি যে ভাবে সে বাগিয়ে নিয়েছিল, জুৎ মাফিক সেটা ঝাড়তে পারলে শ্যামাদাসকে আর মেডিক্যাল কলেজ পর্যন্ত যেতে হত না—একেবারে ডবল প্রমোশন পেয়ে পৌঁছে যেত স্বর্গে।

কখন গুরুবন্দনা শেষ করে গোকুলবাবু পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। কনকেন্দুর ভয়ার্ত বিহ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওসব আর দেইখ্‌তে হবেনা—চইলে আসেন ওখান থেকে। লোকগুলা সব কেয়েক্‌টারলেস্।

—ক্যারাক্‌টারলেস ?

গোকুলবাবু মুখ বাঁকিয়ে বললেন, হাঁ—হাঁ—একটা রাঁধুনি বামনিকে নিয়া যত কেলেঙ্কারী কাণ্ড! ভদ্রঘরের ছেলে সব—ব্যাপারটা দেখেন একবার!

কনকেন্দু সরে গেল ঘটনাস্থল থেকে। তিন মাস আগে যেগুলো কল্পনা করা যেত না—এখন সেগুলো গা-সওয়া হয়ে গেছে। চা-ওলাই ঠিক বলেছিল। কলকাতা শহরের যে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের দল বৃহত্তর জীবনের কাছ থেকে ঘা খেয়ে পালিয়ে এসেছে—ক্ষুধা আর অভাবের তাড়ায় নাম

লিখিয়েছে নিম্নবিত্তের খাতায়, এ বাড়ি তাদেরই পীঠস্থান—তাদেরই তীর্থ। পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে বদলে যাচ্ছে মন—নিজের অজ্ঞাতেই ভদ্রলোকেরা তাদের স্বপ্ন-স্বর্গ থেকে নেমে যাচ্ছে পৃথিবীর পঙ্কভূমিতে। এই বাড়ি তারই সন্ধিক্ষেত্র—তাই গীতাপাঠের সঙ্গে সঙ্গে গণিকাতত্ত্ব এক সঙ্গে সুর বেঁধেছে এখানে।

মুখ ধুয়ে সে যখন ঘরে ফিরল, তখন গোকুলবাবু আর নকুল দুজনেই বেরিয়ে গেছেন কাজে। ওভারশিয়ার মন দিয়ে দাড়ি কামাচ্ছে, কাছেই যতীন পুতিতুণ্ডি বেশ ঘন হয়ে বসে বিড়ি টানছে। আর হাসছে খ্যাঁক খ্যাঁক করে।

কনকেন্দুকে দেখেই যতীন হাসি বন্ধ করল। কোনো অশ্লীল রসিকতা চলছিল বোধ হয়—ওকে দেখেই চুপ করে গেল। এইটুকু সম্ভ্রম এখানে মেলে —বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের সামনে ওরা সবাই থাকতে চেষ্টা করে সাধ্যমত সংযমী হয়ে। কখনো কখনো কনকেন্দুর মনে হয়, সে যেন এখানে অবাঞ্ছিত – ওর অস্তিত্বটা সব সময়ে অন্য মানুষগুলোকে ঘিরে রাখে অস্বস্তি দিয়ে।

সুটকেসের ওপর থেকে ছোট আয়না তুলে নিয়ে সে চুল আঁচড়ালো, তারপর জামা কাপড় পরে বেরিয়ে পড়ার জন্যে পা বাড়ালো।

—চা খেতে যাচ্ছেন নাকি ?—প্রতিদিনের প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করলে পুতিতুণ্ডি।

—হাঁ, ঘুরে আসছি একটু—দৈনন্দিন জবাবটার পুনরুক্তি করেই ঘর থেকে বেরুল কনকেন্দু, চটিটা টেনে নিয়ে নেমে গেল নিচে।

শুধু চা খাওয়া নয়, খবরের কাগজটাও একটু নাড়াচাড়া করা দরকার। কিছুদিন থেকেই সুদেতন জার্মান নিয়ে দস্তুরমতো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ইয়োরোপের আবহাওয়া। ফ্রান্স আর ইংলণ্ডের দরজায় দরজায় বেনেস্ কাঁদুনি গেয়ে বেড়াচ্ছেন; হিটলারের গর্জনে কেঁপে কেঁপে উঠছে 'রাইখে' ফ্রেডারিক দি গ্রেটের শিলামূর্তি—চেম্বারলেন তাঁর ছাতা দিয়ে সে আসন্ন অগ্নিবৃষ্টিকে ঠেকাতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে না। গোয়েরিংয়ের সিগ্‌ফ্রিড লাইন অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পেত্যাঁর ম্যাজিনো লাইনের দিকে।

সুদূর ইয়োরোপের এই বজ্রস্তম্ভিত আকাশের কথা ভাববার মতো সময়

আটাত্তরের-একের-এ বাড়িতে বিশেষ কারো আছে বলে মনে হয় না। কাগজ একখানা হীরেনদাদের ঘরে আসে, সেইটেই সে পড়তে পেত আগে। কিন্তু মাসখানেক হল, কী একটা কাজে হীরেনদা গেছেন কানপুরে। কাগজটা এখন সাধুর চার্জে থাকে। মার্চেণ্ট অফিসে চাকরীকরা ওই গেরুয়াধারীকে কনকেন্দু সহ্য করতে পারেনা, প্রথম দিনটি থেকেই কেমন একটা বিরূপতা এসেছে ওর সম্বন্ধে। ওর কাছে গিয়ে কাগজ চাইতে প্রবৃত্তি হয়না।

ছু পা এগিয়ে চায়ের দোকানটায় ঢুকল সে।

সামনে বড় উনুনটায় এর মধ্যেই গন্‌গনিয়ে আগুন উঠেছে, তপ্ত গন্ধ ছড়িয়ে টগবগ করে ফুটছে বড় মটর। প্রায় সারাদিন সেদ্ধ হয়ে তারপরে ওগুলো ঘুগ্‌নিতে রূপান্তরিত হবে। বিকেলের দিকে জড়ো হতে থাকবে ঘুগ্‌নির খরিদ্দারের দল—লেবুর রস আর লঙ্কার গুঁড়ো সহযোগে মদের চাট হয়ে উঠবে রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে। সোডার বোতল খোলবার ফট্‌ফট্‌ আওয়াজ উঠবে —নিঃশেষ হয়ে যাবে ঘুগ্‌নির হাঁড়ি।

রাস্তার ধারে একখানা অন্ধকার ছোট ঘর—সামনে ছুটো বড় উনুন—- এই তো দোকানটার চেহারা। এমনিতে চোখে পড়বারও কথা নয়। কিন্তু এই দোকান জমে ওঠে রাত দশটার পরে। গোলাপী গেঞ্জির ওপর পাতলা আদ্দির গিলে করা পাঞ্জাবী, মাথায় বাবরী চুল—একদল লক্কা মার্কা বাবু তখন এখানে এসে আসর বসায়। রিক্‌শা থেকে নামে মুখে কড়া রং মাখা চটকদার শাড়ি পরা এক ধরনের মেয়ে—তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তারা হেসে ওঠে—ফস্‌ফস্‌ করে সিগারেট ধরায়। সেই সময় হঠাৎ কোথা থেকে ছুটি-একটি পাহারাওলা এই দোকানের আশে পাশে কিছু প্রাপ্তির আশায় ঘুর ঘুর করতে থাকে। কনকেন্দু এখন জানে, ওই লক্কা মার্কা বাবুরা --যখন তখন কোমর থেকে আধহাত লম্বা ফলার ছোরা বের করতে পারে—রাত দেড়টার সময় পৈশাচিক চিৎকার তুলে রাস্তার ওপর দমাদম সোডার বোতল ছোড়া ওদের প্রতিদিনের অভ্যাস। চা ওলার অমন লাল টকটকে চোখের অর্থটাও সে বুঝতে পারে এখন।

প্রথম প্রথম এই চায়ের দোকানে ঢুকতে তার গা ঘিন ঘিন করত— এখানকার কালো ময়লার রেখাটানা কানাভাঙা পেয়ালার চায়ে•চুমুক দিতে

গুলিয়ে উঠত শরীর। কিন্তু ওসব উন্নাসিকতা কেটে গেছে আস্তে আস্তে। এখন সে জানে, দু পয়সায় অতখানি চা এ অঞ্চলের আর কোনো দোকানে পাওয়া যায় না– এখানকার কেকে পচা ময়দার গন্ধ থাকলেও অন্য যে কোনো দোকানের চেয়েই তা সস্তা।

আর, সব চাইতে বড় কথা—এখানেও নিয়ম মাফিক একটা খবরের কাগজ আসে। কিন্তু তার দাবীদার কম—যারা পড়তে চায় তারা আগ্রহভরে ওলটায় আইন-আদালতের পাতা, সন্ধান করে কোনো মুখরোচক নারীঘটিত মোকর্দমার। আর কখনো খেলায় মোহনবাগান হেরে গেলে রেফারীকে প্রহার করবার পরিকল্পনাও নেওয়া হয় এখান থেকে।

কনকেন্দু ভেতরে ঢুকে একটা টিনের চেয়ার টেনে নিলে। সামনে লম্বা টেবিল। এককালে টেবিলটা ওয়াল-পেপার দিয়ে মোড়া ছিল, এখন তার ক্ষীয়মান অবশেষ ময়লায় কলঙ্কিত। শুকনো ঘুগনিদানা, পেঁয়াজের কুচি আর ইতস্তত বিস্কুটের গুঁড়ো। দেওয়ালে বছর দুই আগেকার একখানা ক্যালেণ্ডারের ছবি—কোনো সিনেমা অভিনেত্রীর হাস্যবিগলিত মুখ ; কিন্তু সে মুখের একদিকে কেউ খানকটা খাওয়ার চুণ লেপে দিয়েছে—মনে হয় গালে যেন ধবল হয়েছে মেয়েটার।

এই বেলা-ন'টার সময়েও ঘরের ভেতর ঝাপসা প্রায়ান্ধকার। যারা আসবার, তারা এর আগেই চায়ের পাট চুকিয়ে চলে গেছে। শুধু টেবিলের শেষ কোণায় এক বুড়ো ভদ্রলোক আধ কাপ চা সামনে নিয়ে বসে আছেন ধ্যানস্থের মতো—ঝিমুচ্ছেন। হাতে একটা বিড়ি ধরা—তার ক্ষীণ ধোঁয়াটা রেখায় রেখায় উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে।

লোকটিকে প্রায়ই এইভাবে বসে থাকতে দেখা যায়। বোধ হয় আফিং খান—একটু বেশি মাত্রাতেই খান। মাথার শাদা চুলগুলো জট-পাকানো—ভ্রূদুটো পর্যন্ত শাদা। মোটা গোঁফের নিচের অংশটুকু তামাকের পাটকিলে রঙে রাঙানো। সমস্ত মুখ অসংখ্য রেখায় আবিল—হঠাৎ মনে হয় একটি ছোট ছেলের শ্লেটের মতো কেউ সেখানে হিজিবিজি কেটে দিয়েছে।

হঠাৎ কী মনে করে নড়ে-চড়ে উঠলেন ভদ্রলোক। বিড়িটাকে ফেলে দিলেন পায়ের তলায়। তারপর এক চুমুকে সবটা চা নিঃশেষ করলেন।

ঘড়ঘড়ে গলায় ডাকলেন, গাঙ্গুলী?

চা-ওলা একটা খুন্তি দিয়ে ঘুগ্‌নির মটরগুলো নাড়াচাড়া করছিল। লাল চোখ তুলে বললে, আবার কী হল?

—হাফ কাপ চা দাও আরো।

—দিচ্ছি।

দোকানের একতম বয় কনকেন্দুর জন্যে কেক কাটছিল। হঠাৎ হেসে উঠল শব্দ করে।

—এই—হাসছিস যে?—বুড়ো ভদ্রলোক প্রশ্ন নিক্ষেপ করলেন উগ্রস্বরে।

—বার বার হাফ কাপ চা না খেয়ে দু বার ফুল কাপ খেলেই তো চলে দাদু।

—চলে?—দাঁতের অভাবে হঠাৎ মাড়ি খিঁচোলেন ভদ্রলোক: তুমি সেটা কী করে জানলে, শুনি?—

মাড়ির অন্তরালে মুখের ভেতরে একটা অতলস্পর্শ অন্ধকার দেখা গেল: অতই যদি পণ্ডিত হয়েছ, তা হলে চায়ের দোকানে বেয়ারাগিরি করছ কেন? যাওনা—কেশব সেনের সমাজে আচার্যি হয়ে বোসোগে?

ঘুগ্‌নি নাড়তে নাড়তে গাঙ্গুলী একটা ধমক দিলে: এই বকু!

বকু জবাব দিলে না—কেকের টুকরোটা একটা প্লেটে সাজিয়ে কনকেন্দুর সামনে নামিয়ে দিয়ে গেল। তারপর কেটলি থেকে চা ঢালতে লাগল বুড়োর জন্যে। শুকনো ভাঙের পাতার মতো একটা বুনো গন্ধ উঠতে লাগল চায়ের ধোঁয়া থেকে।

বুড়ো এবার একটা বিড়ি ধরালেন। কিন্তু একটা টান দিয়ে আবার তেমনি ঝিম ধরে বসে রইলেন। কনকেন্দু গভীর মন দিয়ে দালাদিয়েরের বক্তৃতা পড়তে লাগল।

বকু চা এনে সামনে রাখতেই বুড়ো জেগে উঠলেন। তেমনি ঘড়ঘড়ে গলায় হঠাৎ ধমকে উঠলেন: এই ছোঁড়া—দাঁড়া!

ছোকরা সভয়ে দাঁড়িয়ে রইল। 'কাগজ থেকে মুখ তুলে উৎকর্ণ চোখে কনকেন্দু তাকালো।

—আমি কে, জানিস?—শাদা ভ্রূর তলা থেকে দুটো ঘোলা চোখ জলে উঠল, এই তিনমাসের মধ্যে যেন এই প্রথম সে লোকটিকে সম্পূর্ণ চোখ মেলে তাকাতে দেখল। যেন ঘুমিয়েছিল একশো বছর—রিপ্ ভ্যান্ উইংকলের মতো জেগে উঠল হঠাৎ।

বকু ঘাবড়ে গিয়ে কী একটা বলতে চেষ্টা করল কিন্তু সেটা শুনতে পাওয়া গেল না।

—বলি, মদন শীলের নাম শুনেছিস? অ্যাঁ—শুনেছিস কোনোদিন?

বকু ঘাড় নাড়ল। না—সে শোনেনি।

—তুই শুনবি কোত্থেকে? শুনেছে তোর বাপ-ঠাকুর্দা, তাদের জিজ্ঞেস করিস। এই সোনাগাছি পাড়ার সব চেয়ে সেরা কাপ্তেন কে ছিল জানিস? জানিস – সারা কলকাতায় কার চল্লিশখানা বাড়ি ছিল, কার পাঁচখানা বাগান-বাড়িতে মুজরো করতে যেত থিয়েটারের সেরা মেয়েরা, আর কলকাতার বাছাই বাইজীর দল? জানিস, জয়পুরের রাজার খাস বাইজীকে কে এনে রেখেছিল পাক্কা একটি বছর? মুড়ে রেখেছিল জহরৎ দিয়ে?

গাঙ্গুলী বিরক্ত হয়ে উঠল: ওসব কী হচ্ছে হে? ছেলে-ছোকরাদের আর শোনাচ্ছ কেন কুকীর্তির কথা?

—আহা-হা গাঙ্গুলী, একেবারে ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির সাজলে যে! বয়েস কালে তুমি তো আর কোনোদিন ছেলে বখাওনি? বলি, বাই নাচ যখন জমে উঠত, তখন তবলা ধরত কে? আমার মদের ভাঁটি তো তুমিই অর্ধেক সাবড়েছ—মনে আছে সে সব?

গাঙ্গুলী অস্বস্তিভরে বললে, থামো—থামো—খুব হয়েছে।

মদন শীল বললেন, থেমেই তো আছি হে। এই সব দুধের ছেলেও যখন মোড়লী করতে আসে, তখন পিত্তি-ইস্তক জলে যায়। ওরে ছোঁড়া—শোন্। আজ নয় দ'য়ে পড়েছি, কিন্তু একদিন সোনার গেলাসে মদ খেতুম—বুঝলি? সেদিন যারা আমার হুঁকোবর্দার ছিল, আজ তারাই চৌঘুড়ি ছোটায়!

হঠাৎ মদন শীল উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়ালেন: মোহর বকশিস দিয়েছি—জানিস, একেবারে আদত আকবরী মোহর। রেশমী রুমালে বেঁধে প্যালা দিয়েছি। কোনোদিন চোখেও দেখিস্‌নি সে সব। আমারও সর্বস্ব গেল—কলকাতাও পালটে গেল। তাই বলে ভাবিসনি আমি মরে গেছি! মরা হাতী এখনো লাখ রূপেয়া।

এক চুমুকে বাকী হাফ কাপ শেষ করে নেমে গেলেন রাস্তায়।

ছোকরাটা মিটমিটে দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থেকে বললে, পাগল!

গাঙ্গুলী আবার ধমক দিলে। কিন্তু রীতিমত ক্রুদ্ধ গলায়: চুপ কর্‌। যা বুঝিসনে—কেন কথা কইতে যাস্‌ তাই নিয়ে?

দালাদিয়েরের বক্তৃতাটা আর ভালো লাগল না। গাঙ্গুলীর মুখের ওপর চোখ পড়তেই এক ধরনের করুণায় ভরে উঠল কনকেন্দুর মন। সবটাই কি বানিয়ে বলে গেলেন মদন শীল, একপ্রস্থ চালিয়াতী চালিয়ে গেলেন আফিঙের ঝোঁকে? কিন্তু আশ্চর্য রকমের নতুন লাগছে গাঙ্গুলীর মুখের চেহারা, লাল চোখ দুটোয় স্মৃতির ছোঁয়া লেগেছে—গালে-কপালে পড়েছে বিস্মৃত ইতিহাসের খানিকটা রেখাঙ্কন। লোকটা যেন কীটে কাটা একটা জীর্ণ পাণ্ডুলিপি; পাতা-গুলো একবার উল্‌টে গেলেই বিচিত্র সব কাহিনী—আরো বিচিত্র সব ছবি বেরিয়ে আসবে নতুন দিনের আলোয়। যেদিন জংলা জলা আর ফাঁকা মাঠের বালিগঞ্জ অন্ধকারে পড়ে আছে, নতুন কলকাতা যখন ভ্রূণেরও রূপ ধরেনি, সেদিন এই উত্তর-কলকাতায় বাবুতন্ত্রের শেষ অধ্যায় তার মৃত্যুমশাল জ্বালাচ্ছে। হাজার ডালের ঝাড়বাতিতে আলো করা আসরে বাইনাচের ঘটা, লক্ষ টাকা খরচ করে পুতুলের বিয়ে, রাসে, ঝুলন পূর্ণিমায়, জুড়ি গাড়িতে একটা উদ্দাম বিলাসের বন্যা বয়ে গেছে, গেছে এই পথ দিয়েই। সেদিন পেনিটি-দমদমার বাগানবাড়িতে বাইজীর পেশোয়াজে ঘূরপাক খেয়েছে কামনার অলাত-চক্র, সুর্মা টানা চোখ থেকে বিষকন্যার দৃষ্টিবাণে মরণের নেশায় ঢলে পড়েছে কলকাতার সেরা বাবুরা। সারেঙ্গীর টানে টানে বিষ উঠেছে বুদবুদিয়ে। মোহের কলার মান্দাসে কত বিলাসী লখীন্দরের শব ভেসে গেছে সুরার সমুদ্রে। মদন শীল সেদিনের ভাঙা মদের গ্লাস—গাঙ্গুলী সেদিনের উচ্ছিষ্ট-অবশেষ।

—বার্ণার্ড শ বলিস, আর যাই বলিস—

কনকেন্দু চকিত হয়ে উঠল। তিন চারটি ছেলে—এদিকে কুমারটুলী অঞ্চলে কোথায় একটা সাহিত্যিক আড্ডা আছে ওদের। একেবারে হালের বেরুনো দু একখানা নতুন বই হাতে করে মাঝে মাঝে এই চায়ের দোকানে এসে বসে, জমিয়ে তোলে সাহিত্যের আসর। হাতে লেখা একটা পত্রিকাও দেখেছে ওদের—নাম "দাবী"। কিসের দাবী কে জানে। কিন্তু সাহিত্যের ওপর অনুরাগ যতই থাক, পকেটের অবস্থা যে কারোই খুব সুখের নয়—বেশবাস দেখলেই বোঝা যায় সেটা। কয়েকটা সিগারেট আর কয়েক পেয়ালা চায়ের দাবী মেটানোই ওদের সমস্যা আপাতত।

—এ বাবা তোমার গায়ের জোরের কথা।—মোটাসোটা চেহারার একটি ছেলে, শার্টের কলার দুটো বিদ্রোহী ভঙ্গিতে উঁচু করে তোলা—শব্দ করে একটা টিনের চেয়ার টেনে নিয়ে বললে, ও সব শেভিয়ান সিনিসিজ্‌ম চলবে না। জীবনকে দেখতে চাও—হাঁ, দ্যাখো রোমাঁ রোলাঁর চোখ দিয়ে।

—তুমি শ'র ব্ল্যাক্ গার্ল পড়েছ ? ব্ল্যাক গার্ল ইন্ সার্চ অব্ গড ?

কনকেন্দু উঠে পড়ল। সব সহ্য হয়—সাহিত্য-আলোচনাটা কেমন বরদাস্ত হয় না তার। কেমন মনে হয়ঃ লেখক যা বলেছেন তাকে ভুল ব্যাখ্যা করা হয় ; যা বলেননি, সেইটে চাপানো হয় তাঁর ওপরে ; এবং যেটা তিনি বলতে চাননি, সেটা কেন বলা হয়নি তার জন্যে কৈফিয়ৎ চাওয়া হয় তাঁর কাছে।

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এল কনকেন্দু। গাঙ্গুলীকে পয়সা মিটিয়ে দিয়ে পা বাড়াল ঘরের দিকে।

ঘরে আর কেউ নেই আপাতত। সোলার হ্যাট মাথায় চাপিয়ে, বারান্দা থেকে ঝরঝরে সাইকেলটা নিয়ে কখন বেরিয়ে গেছে সুদাম পাল। কেবল যতীন পুতিতুণ্ডি তার বড় ট্রাঙ্কটা থেকে একটা একটা করে বার করছে সুবাসিত তেলের বোতল আর বাতের অব্যর্থ মলমের কৌটো।

—এখনো বেরোননি যতীনবাবু ?

—আজ একটু দেরী করে বেরুব, শরীরটা ভালো নেই তেমন—তেলের

শিশি আর মলমের কৌটো থেকে মাথা তুলল যতীন পুতিতুণ্ডি : আপনার কথাই ভাবছিলাম কনকবাবু।

—কেন বলুন তো?—নিজের গোটানো মাদুরটা টেনে নিয়ে কনকেন্দু বসল।

—আপনি শিক্ষিত লোক—এক আধটু লেখা-টেখা নিশ্চয় আসে?

—কী চাই বলুন না আপনার?

যতীন মাথাটা একবার চুলকে নিলে : বেশি কিছু নয়, এই একটা বিজ্ঞাপন। বেশ ভালো করে লিখে দিতে হবে—যাতে লোকে পড়ে বেশ—বুঝলেন না, ইয়ে হয় আর কি!

যতীন পুতিতুণ্ডির একটা বিশেষত্ব বরাবর লক্ষ্য করেছে কনকেন্দু। সুন্দর পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় কথা বলে, পূর্ববঙ্গের লোক বলে চেনাই যায়না তাকে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের লোকের কাছে ইচ্ছে করেই সে বাঙালে কথা বলে—কেমন একটা চ্যালেঞ্জের যেন রোখ আছে তার। হয়তো এক ধরণের স্বদেশীয়ানা—খদ্দরের টুপি মাথায় পরে সাহেবী হোটেলে লাঞ্চ্ খেতে যাওয়ার মতো।

—কিন্তু আমাকে দিয়ে কি সুবিধে হবে?—কনকেন্দু জানতে চাইল।

—সুবিধে হবে না কেন, চমৎকার হবে!—যতীন সোৎসাহে উবু হয়ে বসল : অনেকটা এই রকম লিখবেন আর কি—বিশ্ববিখ্যাত জে, পি, কেমিক্যাল্‌সের অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার!

—জে, পি, কেমিক্যালস্?

—হাঁ—হাঁ—জে, পি মানে যতীন পুতিতুণ্ডি। একবার ভেবেছিলুম 'পেটাগুা' নাম দেব, লোকে সায়েব কোম্পানী ভেবে চম্‌কে উঠবে। তারপর মনে হল, দূর ছাই, স্বদেশী যুগ—জে, পি-টাই ভালো হবে সব চেয়ে। মানে, এই রকম লিখে দেবেন আর কি : হিমালয়ের সাধু কর্তৃক অলৌকিক শক্তিবলে আবিষ্কৃত পার্বত্য বনৌষধি হইতে প্রস্তুত এই 'বাতঘাতী মলম' একেবারে অব্যর্থ। হাড়ের বাত, গেঁটে বাত, পিঠের বাত, কোমরের বাত ইত্যাদি সর্বপ্রকার বাত নিরাময় করিতে—

—হিমালয়ের সেই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সাধুটি কে? আপনি নাকি?

কনকেন্দু জানতে চাইল : আচ্ছা যতীনবাবু, সত্যিই এসব ওষুধ আপনি পেলেন কোত্থেকে ?

যতীন বললে, কোত্থেকে আবার! দিন কয়েক এক কবিরাজের কম্পাউণ্ডারী করেছিলাম, সেখান থেকেই গুরুমারা বিদ্যে!

—তা হলে এসব ভড়ং চাপাচ্ছেন কেন ? বললেই হয়, আয়ুর্বেদীয় ওষুধ ?

যতীন পুতিতুণ্ডি লজ্জিত হাসি হাসল : আর বলেন কেন ? এ সব ভড়ং না থাকলে লোকে কিনতে চায় নাকি ? দেখছেন না, কলকাতার অলিতে গলিতে ফরাস পেতে কবরেজ বসে আছে ? কে পোঁছে তাদের ? নেহাৎ মোদক না হলে ছোকরাদের চলে না, তাই অধিকাংশই টিঁকে আছে নেশার যোগান দিয়ে। সে যাক। নইলে এমনও লিখতে পারেন, সাতদিন এক নাগাড়ে তারকেশ্বরের মন্দিরে ধর্ণা দিয়ে শিব চতুর্দশীর রাত্রে স্বপ্নে-প্রাপ্ত—আরো জোরালো হবে, না ?

—বাঃ, চমৎকার বলছেন তো ?—কনকেন্দু সশ্রদ্ধ হয়ে উঠল : আপনিই তো লিখে নিতে পারেন। ঢের ভালো হবে আমার চেয়ে।

—কী যে বলেন !—যতীন আরো লজ্জা পেলো : মুখে দিনরাত বকবক করতে করতে কথা একরাশ সব সময়েই আসে। তাই বলে লেখা কি আর আমাদের কাজ! দু' লাইন লিখতে দশটা কলম ভোঁতা হয়ে যাবে—তা দেবেন তো লিখে ?

—আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখব।

—চেষ্টা নয়, লিখে দিতেই হবে। দু একদিনের ভেতরই আবার ছাপতে দেব কিনা।

কনকেন্দু হাসল : কিন্তু পারিশ্রমিক কী দেবেন আমাকে ? বাত তো আমার নেই—শীগ্‌গিরই হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে বলেও মনে হয় না। অন্তত এক শিশি তেল পাওয়া যাবে নিশ্চয় ?

যতীন জিভ কাটল : সর্বনাশ! কাকের মাংস কি কাকে খায়? রাম—রাম!

—কেন, এই তো লেখা রয়েছে—ইহা ব্যবহারে মাথা ঠাণ্ডা হয়, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হয়, রাত্রিতে সুনিদ্রা হয়—

যতীন পুতিতুণ্ডি একবার চোরের মতো চারদিকে তাকালো, যেন দেখে নিতে চাইল কেউ আড়ি পেতে শুনছে কিনা! তারপর চাপা গলায় বললে, কচু হয়!

—সে কী মশাই! আপনি নিজে ম্যানুফ্যাকচারার—

—আরে, ম্যানুফ্যাকচারার বলেই তো বলছি! ওদিকে ব্যাণ্ডেল আর এদিকে নৈহাটি—এর ভেতরে এ তেল আমি বেচিনা—জানেন? আপনাকে বলব কি, আমার এই তিল তেল শিশি তিনেক মাখলেই আর দেখতে হবে না, আপনার অমন চমৎকার কোঁকড়া চুল আর একটিও থাকবে না। দিব্যি চকচকে একটি মাথা-জোড়া টাক গজিয়ে যাবে।

কনকেন্দু আঁৎকে উঠল: বলেন কি! জেনে-শুনে লোককে আপনি ঠকাচ্ছেন!

—আপনি এখনো ছেলেমানুষ কনকবাবু! আরে মশাই, জেনে-শুনে আমি ঠকাইনা—লোকে জেনে-শুনেই ঠকে। কী করে বিশ্বাস করে যে মাত্র ছ-আনায় এতবড় একশিশি সুবাসিত তিল তেল পাওয়া যায়! আর তাই মাখলে রাত্রের সুনিদ্রা থেকে শুরু করে হারানো গোরুর পর্যন্ত সন্ধান মেলে! আসল কথা কী জানেন—লোকে ঠকতে চায়, ঠকতেই ভালবাসে। বুঝলেন, হাতুড়ে ডাক্তার এগিয়ে গিয়ে লোকের মাথায় হাতুড়ি পেটেনা, লোকেই মাথা এগিয়ে দেয়! তাই আপনি না ঠকালেও অন্যে যখন ঠকাবেই—তখন সে সুযোগ কেন ছাড়তে যাবেন বোকার মতো?

চমৎকার নির্ভুল যুক্তি—জীবন দর্শন মেড্ ঈজি! কনকেন্দু হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। আর বেশ সারবান্ একটা বক্তৃতা দেবার গর্বে উল্লসিত মুখে যতীন পুতিতুণ্ডি দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে কান চুলকোতে লাগলো।

—লিখে দিন, খুব জোরালো করে লিখে দিন। এক দিন বেশ করে চপ কাটলেট খাইয়ে দেব।

খট্-খট্—ঘর্-ঘর্—ঘর্-ঘর্—

এদিকের লাগাও ঘরটা থেকে সেলাই কলের আওয়াজ উঠল। জানা না থাকলে মনে হত একটা মোটর লরীর এঞ্জিনের আওয়াজ বুঝি! এ ঘরের

মেজেটাও কেঁপে উঠল, আর বন্ধ দরজার ভেতর দিয়েও পচা মাড়ের মতো কিসের একটা উগ্র অম্ল গন্ধ ভেসে এল।

—ওই রে, আবার শুরু হল উৎপাত—মুখ বাঁকাল যতীন।

দিনকয়েক থেকে ও ঘরে একটা দর্জির কারখানা বসেছে। দুটো পা-কল যখন তখন খট খট করে চলতে আরম্ভ করে—আর ওই উগ্র অম্ল গন্ধটা ভেসে আসে। কেমন অস্বস্তিকর গন্ধ – কখনো কখনো গা বমি বমি করতে থাকে। কী সেলাই করে ওখানে? কনকেন্দু একবার উঁকি দিয়ে দেখেছিল, নানা রঙের একরাশ জরির কাপড় স্তূপাকার করে নিয়ে বসেছে ওরা—ওই কাপড়-গুলো থেকেই এই রকম উৎকট গন্ধটা ছড়ায়।

—রাতদিন ওগুলো ওরা কী সেলাই করে বলুন তো?

—রাজপোষাক।

—রাজপোষাক?

—হাঁ মশায়, যাত্রা থিয়েটারের পোষাক!—যতীন পুতিতুণ্ডি বললে, রাজা থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত কেউ বাদ নেই। বেশ ভালো ব্যবসা মশাই – কোনো হাঙ্গামা হুজ্জুত করেনা কেউ। কাঁধটা ঠিক হয়নি – এদিকের হাতটা একটু সরু হয়েছে, ঝুল আর এক ইঞ্চি হলে ভালো হত—খদ্দেরের এসব নানান বায়নাক্কা কিছুই সইতে হয় না। একটুখানি চকচকে ঝকঝকে—আর কোনোমতে গায়ে একবার গলাতে পারলেই হল। যাত্রার রাজার গায়ে বেশ ঝিকমিক করবে, তাই দেখেই লোকে খুশি। ছাতি আর ঝুল ঠিক আছে কিনা – কে আর এখন ফিতে নিয়ে ওসব মাপতে যাচ্ছে বলুন।

—কিন্তু ওরকম গন্ধ কেন কাপড়গুলোতে?

—কে জানে—কী দেয়-টেয়!—যতীন তাচ্ছিল্যভরে বললে, মাড়-ফাড় কী ওসব! মরুক গে, রাজা-রাজড়ার পোষাক—যারা গায়ে দেবে, তারাই বুঝবে এখন। আপনি-আমি তো আর পরতে যাচ্ছিনা ওগুলো!

বড় একটা চটের থলির মধ্যে যতীন সযত্নে শিশি আর বাতের কৌটোগুলো পুরে ফেলল: যাই, এবারে চান করার চেষ্টা দেখি গে। কলটল এতক্ষণে খানিক ফাঁকা হয়েছে নিশ্চয়।

কনকেন্দু মাথার কাছে রাখা বি-টাইমপিস ঘড়িটার দিকে তাকালো। সাড়ে দশটা বেজে গেছে, তারও বেরুবার উদ্যোগ করতে হবে। বারোটায় ক্লাশ।

নিমের একটা শুকনো কেঠো দাঁতন চিবুতে চিবুতে যতীন উঠল: কিন্তু আমার কথাটা মনে থাকে যেন। বেশ ভালো করে গুছিয়ে একটা বিজ্ঞাপন লিখে দেবেন।

যতীন বেরিয়ে গেল। কনকেন্দু ভাবতে লাগল, স্নানের জন্যে গঙ্গার দিকেই পা বাড়াবে কিনা এখন। কলে জল পাওয়ার আশা আপাতত বিড়ম্বনা। আর যা পাওয়া যাবে, তাও তলানি, কাকের কল্যাণে শ্যামাদাসের হোটেলের একরাশ কাঁটা আর ডাঁটা চিবোনো তার মধ্যে পাক খাচ্ছে তরল বর্মী 'নাপ্পীর' মতো। তার চেয়ে গঙ্গার ঘোলা জলই ভালো।

উঠতে যাবে, হঠাৎ খুক খুক করে কাশির আওয়াজ। তাকিয়ে দেখল, যোগদাবাবু ঢুকছেন।

থার্ড ব্র্যাকেটের মতো এই বাড়িটার দক্ষিণ বাহুর একেবারে শেষ কোণায় থাকেন যোগদাবাবু। তাঁর ঘরটি ছোট এবং সে ঘরে তিনি একাই বাসিন্দা। অনেকের চাইতে অবস্থা তাঁর সচ্ছল—হাটখোলার বাজারে কিসের একটা দোকান আছে তাঁর। যোগদাবাবুর ঘরে তক্তপোষ আছে, একটা কাপড়ের আল্না আছে, একখানা চেয়ারও তিনি রাখেন এবং তাতে বসে গড়গড়া টানবার মতো ভাগ্যবান তিনি; দেওয়ালের তিনদিকে তিনখানা সিনেমা-সুন্দরীর রঙিন ছবিও ঝুলিয়ে রেখেছেন পরম সমাদরে। তাদের একটি আবার প্রায় নগ্নিকা।

তবু এ বাড়ির দোতলার ত্রিশজন লোক কেউ তাঁর সঙ্গে মেশামেশি করে না। তার প্রধান কারণ, যোগদাবাবু কাউকে এক পয়সা ধার দেন না, তাঁর দোকানে গেলে কাউকে বাকি দেন না এবং কখনো কারুর কাছ থেকে একটি পয়সাও তিনি ধার করেন না। সন্দিগ্ধ চোখে কেমন একটা কঠিন জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। ভদ্রলোক কথা বলেন অল্প এবং যেটুকু বলেন, সেটুকুও খুব মধুবর্ষী হৃদয়গ্রাহী ভাষায় নয়।

অতএব, এই কারণগুলোতেই তিনি সকলের পরিহার্য। এমন কি রবিবারে দিন যখন ঘরে ঘরে তাস-পাশার আসর বসে, তখনো কৌতূহলী যোগদাবুকে কোথাও উঁকিঝুঁকি দিতে দেখা যায় না। সুতরাং জনপ্রিয় হওয়ার মতো কোনো উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব তাঁর নেই।

তা'ছাড়া গৌণ কারণও আছে দু একটা। ঘরে যতই সিনেমা-স্টারের ছবি টাঙান, আর গড়গড়া মুখে চেয়ারে বসে যতই ধূমপান করুন, যোগদাবাবু কখনো স্নান করেন না। কী একটা অসুখে ভুগছেন, তাই কবিরাজী মতে নাকি স্নান করা তাঁর বারণ। গা থেকে কেমন একটা চাপা দুর্গন্ধ ছড়ায় তাঁর, বাঁ পায়ের গোড়ালির ওপরে একটা ময়লা কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ সব সময়েই বাঁধা,. প্রত্যক্ষদর্শীরা বলে, ওখানে নাকি থক্‌থকে পচা ঘা রয়েছে একটা। যতীন পুতিতুণ্ডি জানিয়েছে, ও ঘা নাকি শুকোবেও না কোনোদিন।

যোগদাবাবু বললেন, আসতে পারি?

—আসুন,—আসুন—কনকেন্দু ডাকল। কিন্তু শরীরটা আপনিই সংকুচিত হয়ে এল একবার। তারই মাদুরে এসে বসবেন এবং তারই পাশে! উপায় নেই, মাদুরটা একবার ধুয়ে রোদে দেওয়া ছাড়া পথ নেই আর।

যথাসম্ভব সরে গিয়ে সে যোগদাবাবুকে বসতে দিলে। গায়ের গন্ধটা এবং পায়ের ব্যাণ্ডেজটাকে এড়াবার জন্যে সৌজন্য বজায় রেখে ঘুরিয়ে রাখল মাথাটা, শ্বাস টানতে লাগল চেপে চেপে।

যোগদাবাবু ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বললেন, আপনার সঙ্গে একটা প্রাইভেট টক আছে।

—আমার সঙ্গে?—কনকেন্দু আশ্চর্য হল। যোগদাবাবুর সঙ্গে তার পরিচয়টা মুখ চেনার বেশি নয়। এমন কী গোপন আলোচনা তার সঙ্গে থাকতে পারে তাঁর?

শার্টের পকেট থেকে যোগদাবাবু একখানা গোলাপী রঙের ময়লা খাম বের করলেন সযত্নে। বললেন, চশমাটা সকালে হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল—একেবারে অন্ধ হয়ে আছি। পড়ে শোনান দেখি চিঠিখানা।

কনকেন্দু চিঠি খুলল। গোলাপী খামের ভিতরে নীল কাগজের চিঠি।

তার ভেতরে কাঁচা কাঁচা মেয়েলি হরফ। কিন্তু প্রথম সম্ভাষণ পড়েই কনকেন্দু চমক উঠল: "প্রাণেশ্বর—"

সভয়ে চিঠিখানা ফিরিয়ে দিয়ে বললে, এটা বোধ হয় আপনার স্ত্রীর চিঠি। এভাবে পড়া ঠিক হবে না।

যোগদাবাবু মুখে একটা বিশ্রী ভঙ্গি করলেন: হাঁ—হাঁ—স্ত্রীর চিঠি বইকি। তৃতীয় পক্ষের গিন্নির। লজ্জা পাবেন না। পড়ে যান আপনি।

—কিন্তু—

—আবার কিন্তু কী মশাই! মেয়েমানুষে ওসব ন্যাকামি করেই। আপনি ভালো ছেলে বলেই এলাম আপনার কাছে। পড়ে দিন—পড়ে দিন। আমার আবার দোকানে যেতে হবে।

আরক্ত হয়ে কনকেন্দু পড়তে লাগল: দাসীকে তুমি কি ভুলে গিয়েছ? পর পর দুইখানি চিঠি লিখেও উত্তর পাই নাই। মশলার দোকান করে করে কি তোমার হৃদয় দারুচিনির মতো শক্ত হইয়া গিয়াছে? এই অভাগিনী বিরহিনী তোমার পত্রের আশায় চাতকিনীর মতো বসে থাকে, তাহা কি তুমি জানো না?

বানান ভুল আর খারাপ হাতের লেখায় হোঁচট খেতে খেতে কনকেন্দু যখন এইটুকুর পাঠোদ্ধার করলে, তখন যোগদাবাবুর মুখে প্রেমিকের একটা স্বর্গীয় সৌন্দর্যই আশা করা গিয়েছিল; কিন্তু পরম বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে পেল একটা কটু বিতৃষ্ণায় যোগদাবাবু বীভৎস হয়ে উঠেছেন।

—আহা-হা, মরে যাইরে! বিরহিনী—চাতকিনী! যেন পদ্যপাঠ শোনাচ্ছেন! কত ছলা-কলাই না জানেন! তবু যদি কেলে হাঁড়ির মতো চেহারাখানা না হত!

প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছিল, আপনিই বা কোন্ ময়ূর-বাহন, কিন্তু বাজে কথা বলবার উৎসাহ কনকেন্দুর ছিল না। যোগদাবাবু প্রায় ধমক দিয়ে উঠলেন: কই, থামলেন যে?

—রাত্রিতে শূন্য শয্যায় শুইয়া—কনকেন্দু খানিকক্ষণ লজ্জায় পাংশু হয়ে রইল: মাপ করবেন, এর পর কিছুতেই আমি পড়তে পারবনা।

যোগদাবাবু বললেন, আপনিও যেমন! আজকালকার ছেলে-ছোকরা আপনারা, অত লজ্জা কিসের জন্যে? - কিন্তু কনকেন্দুর দিকে তাকিয়ে এবার বোধ হয় তাঁর একটুখানি করুণাই হল: আচ্ছা, ছেড়ে দিন তা' হলে ওসব কথা। ফষ্টি-নষ্টিগুলো বাদ দিয়েই পড়ুন। আহা-হা, শূন্য শয্যায় শুইয়া! কার কথা যে ধ্যান করেন সে আমার জানতে বাকি আছে কিনা। এসব আবার ফেনিয়ে ফেনিয়ে তিন দিস্তে কাগজে লেখা হয়েছে! ওসবে আমি ভুলি! মাসে মাসে এতগুলো করে টাকা দিই বুঝি কাগজ কিনে আমার শ্রাদ্ধ করার জন্যে?

যোগদাবাবুকে এতদিন বিলক্ষণ অল্পভাষী বলেই জানত। এখন দেখা গেল, তাঁরও একটা জায়গা আছে। সেখানে একবার হাত পড়লে তিনি শুধু বাঙ্ময় নন - মুখর হয়ে ওঠেন দস্তুরমতো।

—আপনি বরং আর কাউকে দিয়েই—

—না-না, ওরা সব ফক্কড়ের দল!—যোগদাবাবু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন: কাউকে বিশ্বাস নেই, জানলেন? ঠিকানাটা যেই পেল, সঙ্গে সঙ্গে হয়তো লভ্ লেটার লিখতে শুরু করে দেবে। আপনি পড়ুন। বলেছি তো, ফুক্কুড়ি-গুলো বাদ দিয়ে যান। দেখুন দেখি, কাজের কথা শেষের দিকে কিছু আছে-টাছে কিনা!

কিন্তু বিরহী প্রেমের এই ব্যাকুলতা পার হয়ে কাজের কথা বার করা দস্তুরমতো প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা। তা ছাড়া দু একটা লাইন যা চোখে পড়ল, তাতে চোখ প্রায় বুজিয়ে আনতে চায়। কনকেন্দু অগত্যা এসে পৌঁছুল শেষের পাতায়।

—মা আমাকে দেখবার জন্যে অনেকদিন থেকে খুব ব্যাকুল হইয়াছেন। তোমার অনুমতি পাইলেই হিজলীতে চিঠি দিব। বিনয়দা আসিয়া আমাকে—

—কী বললেন, কী নাম বললেন!—হঠাৎ অস্বাভাবিক উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যোগদাবাবু: কে আসিয়া?

—বিনয়দা।

—বিনয়দা?—যোগদাবাবু হঠাৎ হিংস্র জন্তুর মতো গর্জন করে উঠলেন: বিনয়দা! সাতকুলের কেউ নয়, কোন্ এক জাতির ছেলে—বিনয়দা!—

যোগদাবাবু ভয়াল মুখে বললেন : আসল টানটা কোথায় বাপের বাড়িতে—বুঝতে পারলেন এইবার ? এই ফচকে ছোকরা—মাথায় বাবরী রাখে, আবার বাঁশিও বাজায়। আমি জানিনে—বুঝিনে কিছু ?—যোগদাবাবু দাঁড়িয়ে উঠলেন, হ্যাঁচকা টান দিয়ে হাত থেকে কেড়ে নিলেন চিঠিটা : দাঁড়ান—যাওয়াচ্ছি বাপের বাড়ি ! ওই বিনয়দার সঙ্গে ওটাকেও স্রেফ গলা টিপে সহমরণে পাঠাব, তবে আমি মোক্ষদা সরকারের ছেলে !

যেন হত্যাকাণ্ডটা এখনি করবেন, এমনি নাটকীয় ভঙ্গিতে যোগদাবাবু প্রস্থান করলেন ঘর থেকে।

কনকেন্দু কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইল। পুরোনো ইতিহাস—তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্রতি অসুস্থ প্রৌঢ় স্বামীর চিরকালের কুটিল সন্দেহ। যৌবনের ক্ষেত্রে বাতিল হয়ে যাওয়ার হিংস্র জ্বালায় আত্মঘাতী জেলাসি ! ওথেলোর অকুপেশন !

কিন্তু বিনয়দাকে তার তো খুব খারাপ লাগছে না। বাবরী চুল, বাঁশিও বাজায়—বয়সে ছোকরা। তার পাশে পায়ে পচা ঘা আর সারা গায়ে দুর্গন্ধ জড়ানো এই ধূসর-শীর্ষ যোগদাবাবু ! পার্থক্যটা বড় বেশি স্পষ্ট—বড় বেশি অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কোন্ গরীব ক্ষুধার্ত বাপ নিরুপায় হয়ে তরুণী কন্যাকে যোগদাবাবুর হাতে তুলে দিয়েছে। কিন্তু হোক কালো, হোক কুৎসিত—মেয়েটির এক টুকরো মন থাকতে তো বাধা নেই। সে মানুষকেই ভালোবাসতে পারে—একটা ভালুককে নয়। এবং যোগদাবাবু নামে যে লোকটি—

ছিঃ ছিঃ—এসব কী ভাবছে সে ! সমাজবিরোধী ভাবনা, দুর্নীতি প্রশ্রয় পায় এতে। তা'ছাড়া স্বাভাবিক একটা হীনম্মন্যতায় ভুগছেন যোগদাবাবু, অদেখা অপরিচিত একটি মেয়ে সম্বন্ধে এসব কথা ভাববার কোন্ অধিকার আছে কনকেন্দুর ? হয়তো সত্যিই তাঁর স্ত্রী আদর্শ পতিব্রতা, সত্যিই 'শূন্য শয্যায় শুইয়া শুইয়া—'

না, এসব পরচর্চার কোনো মানে হয়না। যোগদাবাবুর ব্যাপার—যোগদাবাবুই বুঝবেন। আপাতত স্নান করতে যাওয়া যাক। এর বেশি দেরী হলে আর বারোটার ক্লাশটা করা যাবে না। কনকেন্দু উঠে পড়ল।

—যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এল—গাইতে গাইতে যতীন পুতিতুণ্ডি ফিরল। তার পর কনকেন্দুর দিকে তাকিয়ে বললে, এবেলা খাবেন কোথায় মশাই ?

—কেন ?

—নিচে শ্যামাদাসের হোটেল তো বন্ধ।

—কী হয়েছে ?

—বা-রে, সকালে মারামারি হলনা ? দু জনেই এখন দু জনের নামে থানায় ডায়েরি করতে গেছে। ভাববেন না, দারোগার রদ্দা খেয়ে একটু পরে এক সঙ্গেই কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির হবে।

কনকেন্দু হাসল : এ বুঝি প্রায়ই হয় ?

—হুঁ, মাসে গড়পড়তা একবার। সব ঐ বামুনিটার জন্যেই। তাড়িয়ে দিলেই চলে, কিন্তু তা করবেন না। তাতে যে দুজনেরই নাড়ী ছিঁড়ে যায় কিনা! দেখুন গে, যাঁর জন্যে এত কাণ্ড, তিনি দিব্যি দাওয়ায় বসে একরাশ পানদোক্তা চিবুচ্ছেন।

কিন্তু দেখবার কৌতূহল ছিলনা। মাথায় খানিকটা তেল ঢেলে, গামছাটা টেনে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে।

তিন

শোভাবাজার থেকে ইউনিভার্সিটি—বেশ অনেকখানি রাস্তাই হাঁটতে হয়। কিছুদিন ট্রামেই যাতায়াত করত, কিন্তু এখন আর দরকার হয়না, হাঁটা অভ্যাস হয়ে গেছে। সম্বলের মধ্যে দশটাকার একটা ট্যুশন। ইউনিভার্সিটিতে ফ্রী-শিপ থাকলেও টাকা পাঁচেক হোটেলে আর পাঁচসিকের মতো সীট রেণ্ট্ দিয়ে এমন কিছু উদ্বৃত্ত থাকেনা যে ইচ্ছেমতো যখন-তখন ট্রামে-বাসে ওঠা চলে। এমন কি চীপ মিড ডে'র দু পয়সার টিকেটেও নয়।

হাঁটতে হাঁটতে গেলে কী আর অসুবিধা হয়? গ্রে স্ট্রীট দিয়ে সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ—চওড়া ফুটপাথ ধরে আপন মনে ভাবতে ভাবতে নিশ্চিন্তে হাঁটা যায়—কারু সঙ্গে ধাক্কা লাগেনা সহজে। তারপর মহম্মদ আলী পার্কের পাশ দিয়ে কোণা কেটে বেরুলেই হিন্দু হস্টেল, তারপরেই দ্বারভাঙা বিল্ডিঙের দরজা। কতটুকুই বা রাস্তা! এর চেয়ে ঢের বেশি পায়ে হাঁটার অভ্যেস আছে মফঃস্বলের ছেলের।

কনকেন্দু চলতে লাগল সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে।

—চারগণ্ডা পয়সা হবে দাদা? বাজার খরচ?

একটি মাঝবয়েসী শীর্ণ লোক কানে কানে বললে বিশ্বস্ত ভঙ্গিতে। কিন্তু কনকেন্দু দাঁড়াতে পারলনা। এসব অনেক দেখেছে, অনেক অভ্যাস আছে এ ধরণের কথা শোনবার। কিন্তু চারগণ্ডা পয়সা! কনকেন্দুর হঠাৎ হাসি পেল। উদ্বৃত্ত ব্যয় করবার চারগণ্ডা পয়সা তার পকেটে থাকে, এ কথা ভাববার মতো দু একজন লোকও যে আছে—এতেও খানিকটা আত্মতৃপ্তি বোধ হয় অন্তত।

—কালকেই শোধ দিয়ে দেব। দিন্‌না—হতাশ আবেদন শোনা গেল আর একবার। তা হলে ভিক্ষে নয়—ঋণ! ওটা ভদ্র উপায়। কিন্তু তার কাছে কেন? পথের দু'পাশে সোনার ঝাঁপি খুলে বসে আছেন লক্ষ্মী—বড় বড় সাত মহলা বাড়িতে পাতা রয়েছে তাঁর পদ্মাসন। নাকি, ভিক্ষুকেরও

আভিবিচার আছে? সমগোত্র ছাড়া আর কার কাছে হাত পাততে তার বাধে?

দু ধারে বড় বড় বাড়ি—পথে মোটরের অশ্রান্ত স্রোত। প্রাচুর্য। কত বেশি আছে জীবনে—কত অতিরিক্ত। মুঠো মুঠো দু হাতে খরচ করলেও তা কোনদিন ফুরুবেনা। এই কলকাতা। মেট্রোপলিস্। আটাত্তরের একের এ বাড়িটা এখানে মায়া—আচমকা চোখ কচলে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে—একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিল নাকি কোথাও?

কিন্তু পায়ের তলায় চটিটা থেকে একটা পেরেক! চোরাগোপ্তা ঘা দিচ্ছে। আটাত্তরের একের এ নিজেকে ভুলতে দেবেনা। কত ছোট জীবন—কত সংক্ষিপ্ত! কী সংকীর্ণ বৃত্তের ভেতরে কাঁটা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে পা ফেলতে হয়। একটা ইট্-ফিট কুড়িয়ে নিয়ে পেরেকটা ঠুকে নিলে হয় একবার। কনকেন্দু সন্ধানী চোখে তাকালো। সুবিধেমতো কিছু দেখা যাচ্ছেনা কোথাও।

—পক্ষীর দ্বারা ভাগ্য পরীক্ষা—আশ্চর্য ব্যাপার—

একখানা পোস্ট্‌বোর্ডের ওপর কাঁচা অক্ষরে লেখা বিজ্ঞপ্তি। যতীন পুতিতুণ্ডির আর একটি সগোত্র। তবে যতীন শুধু আধিভৌতিক ব্যাপারটা নিয়েই সন্তুষ্ট, এ একেবারে আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিককে শুদ্ধু সঙ্গে নিয়ে পড়েছে।

মাথায় ঝাঁকড়া চুল, রোগা পাঁশুটে চেহারার লোকটা। দেওয়ালের গায়ে একখানা লাঠির সঙ্গে পেস্ট্‌বোর্ডটা হেলিয়ে বসেছে ফুটপাথে। স্বপ্নাতুরের মতো ঝিমুচ্ছে বসে বসে। তিন চারটে পোড়া বিড়ির টুকরো চারদিকে ছড়ানো। সামনে একটা খাঁচার ভেতরে ছটফট করছে রোগা একটা চড়ুই পাখি—পাশে একরাশ বিবর্ণ শাদা এন্‌ভেলপ। কনকেন্দু জানে ব্যাপারটা। দুটো পয়সা দিলেই চড়ুইটা ঠোঁটে করে একখানা খাম সরিয়ে দেবে। সেই খামের মধ্যে পাওয়া যাবে: চাকরী অবশ্য হইবে, ডার্বির টাকা পাইবেন, কন্যার বিবাহ হইবে, প্রেমিকা বশীভূত হইবে এবং আরো নানারকম মুখরোচক সংবাদ।

কৌতূহল হল। দেখবে নাকি দুটো পয়সা খরচ করে? কে জানে, হয়তো কন্যার বিবাহের প্রতিশ্রুতিই মিলে যাবে তার। না—এত তাড়াতাড়ি

তার কন্যাদায়গ্রস্ত হবার দরকার নেই। কন্যাদায়ে মা-বাপের কী দশা হয়, অনেক গল্প আর নাটকে তার ভয়াবহ বিবরণ পড়েছে কনকেন্দু।

কিন্তু লোকটা নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করেনা কেন একবার? পেট ভরে খেতে না পাওয়ার চিহ্ন তার সর্বাঙ্গে ফুটে আছে—কেন একবার ডার্বির টিকিট পাওয়ার চেষ্টা করে দেখেনা? তার পাখি নিশ্চয় বিশ্বাসঘাতকতা করবেনা তার সঙ্গেই।

কে জানে!

'লো শাহে মর্দা সেরিয়েজ দা কৌঅতে প্রবর দিগায়—'

অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে বিচিত্র সুরের ধ্বনি-তরঙ্গ। আর একজন। কয়েকটা চীনে মাটির গামলায় কালো দুর্গন্ধ তেলের মধ্যে ভেজানো বড় বড় পাহাড়ী কাঁকড়া-বিছে, কতগুলো পাখির ঠোঁট, একটা সাপ। কালো চশমা পরা একটি লোক—মাথায় খদ্দরের টুপি, সমানে দুর্বোধ্য ভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছে:

'লাপ্‌তে লালে লা সাহেবুল্লা জুল্‌ফজুল্লা জুল্‌ফিকার—'

অর্থ কী, ভগবানই জানেন। কিন্তু বেশ একটা ভিড় জড়ো হয়েছে চারপাশে। হাতে একটা শিশি তুলে নিয়ে লোকটা বলে চলেছে: 'যদি কিস্‌কো কাট্ খায় এ সাপ কালা—

সাপের তেল, বাঘের তেল, ধনেশ পাখির তে—এ—এল্।' বাত থেকে শুরু করে টাক পড়া পর্যন্ত সারে। ম্যাজিক দেখাচ্ছে আপাতত। একধারে একটা চুবড়ি রেখেছে চাপা দিয়ে। ওর তলা থেকে নাকি ল্যাংড়া আমশুদ্ধ একটা মস্ত গাছ বেরুবে। গাছটা গোকুলে বাড়ছে—তার আগে সমবেত ভদ্রমহোদয়েরা এই আশ্চর্য তেলের বিবরণ শুনে নিন্ খানিকক্ষণ। আমগাছ অবশ্য কখনোই গজাবেনা—কিন্তু ও লোভটুকু না দেখালে লোক দাঁড়িয়ে থাকবে কেন?

জীবিকা। যতীন পুতিতুণ্ডির আর একটি আদিম সংস্করণ।

কিন্তু কনকেন্দুর আর দাঁড়াবার সময় নেই। মহম্মদ আলী পার্কের পাশ দিয়ে সে দ্রুতপায়ে এগুলো। বারোটা প্রায় বাজে।

ক্লাশটা ভালো লাগলনা। কত সহজ জিনিসকে কত জটিল করে বোঝানো

যায়, তারই একটা প্রাণান্তিক সকরুণ চেষ্টা করছেন অধ্যাপক—গ্রন্থি খোলার চাইতে জট পাকাচ্ছেন আরো বেশি। কেমন করুণা বোধ হল। হয়তো এইটেই স্বাভাবিক ; বেশি সহজ করে বোঝালে পাছে ছাত্রদের সন্দেহ জাগে পাণ্ডিত্য সম্পর্কে, তাই অধ্যাপক নিজের চারদিকে জাল তৈরী করে আত্ম-গোপন করতে চাইছেন তার আড়ালে ; কুয়াশার অবগুণ্ঠন টেনে দিয়ে রক্ষা করতে চাইছেন নিজের অভ্রভেদী মহিমা !

সামনের দু তিনটি বেঞ্চে ছেলেমেয়েরা অনর্গল নোট নিয়ে চলেছে। কী টুকছে ওরাই জানে। অধ্যাপকের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা ? নাইন্‌থ্‌ পেপারের প্রিপারেশন ?

পিছনের বেঞ্চে একজন ঘুমুচ্ছে। একজন বিলিতী উপন্যাস পড়ছে। আর একজন একটা অশ্লীল কার্টুন আঁকছে—চার পাঁচজন চাপা হাসি আর মন্তব্যে উৎসাহ দিচ্ছে তাকে।

—একটু সরুন তো স্যার—

কনকেন্দু পেছন ফিরল। সিল্কের শার্ট পরা একটি ছেলে, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। ভাঙা চোয়াল আর অতিরিক্ত উঁচু অ্যাডাম্‌স অ্যাপ্‌ল। মুখে সন্ত সিগারেট খাওয়ার তামাক-পোড়া গন্ধ।

—সরুন, সরুন একটু—

ছেলেটির হাতে ছোট একটি ক্যামেরা। ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, ডলি মিত্তিরের ছবি নেব একটা—

কনকেন্দু সরে গেল। হাই বেঞ্চের তলায় ক্যামেরার ক্ষীণ শব্দ উঠল : ক্লিক্‌ !

আশ্চর্য দুঃসাহস ! কিন্তু এ জাতের অভিজ্ঞতা এখানে নতুন নয়। ক্ষীণদৃষ্টি অধ্যাপকেরা এসব ছোটখাটো ব্যাপার এখানে দেখতে পাননা ; কিংবা দেখেও হয়তো উপেক্ষা করে যান। এখানে ছাত্রের চাইতে গুরুই বেশি সন্ত্রস্ত হয়ে থাকেন।

মফঃস্বলের ছেলে—প্রথম প্রথম নির্বোধের মতো তাকিয়ে থাকত। পোস্ট্‌ গ্রাজুয়েট সম্বন্ধে যে মায়া-মরীচিকার জাল বুনে রেখেছিল, তার ওপর এক একটা

আঘাত পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন আর্তনাদ করে উঠত মনটা। ভবিষ্যতের মাস্টার অব আর্টস্ ক্লাশের ব্ল্যাকবোর্ডে যা লিখে রাখে সহপাঠিনীদের উদ্দেশ্যে, তা দেখে বিশ্বাস করা শক্ত হত—শিক্ষিত ভদ্র বাঙালির মধ্যে আজো এক বিন্দু রুচিবোধ বেঁচে আছে!

কিন্তু এখন নিরাসক্তি এসে গেছে। এখানকার সম্পর্কে কোন আশা নেই, কোনো নৈরাশ্যও নেই। দুটি একটি ক্লাস ছাড়া বাকী সময়টা ক্লান্তিকর কপচানি। পার্সেন্টেজ্ রাখা ছাড়া আর এতটুকুও দায়িত্ব যেন অনুভব করা যায় না, সেটাও প্রক্সিতেই চলে।

অধ্যাপক বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছেন। এই ফাঁকে পাশের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল কনকেন্দু। ফরাসী ছুটি। এখন পেছনের ছেলেটি লিলি ঘোষ—মিলি বোস—যার খুশি ফোটো তুলুক। সে লাইন ক্লিয়ার করে দিয়ে এল।

কিন্তু যাবে কোথায়?

দু পা এগিয়ে সিনেটের মুখোমুখি ব্যাল্‌কনি। দাঁড়ানো যাক এখানেই।

নিচে মেইন গেটের সামনে দু তিনটি ছেলে রাজনীতির তর্ক তুলেছে। ছাড়া ছাড়া কথা শোনা যাচ্ছে: লেবার—সোশ্যালিজম্—বুর্জোয়া—পাতি-বুর্জোয়া—প্লেখানভ্—স্ট্যাম্‌লার। তবু ভালো—অন্তত সহপাঠিনীরা ছাড়াও আর একটা বৃহত্তর জগৎ আছে এখানে। অন্তত এই একটি জায়গায় বিশ্ব এসে স্পর্শ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়কে—সপ্ত-সমুদ্রের ঢেউ এইখানে উঠছে-পড়ছে।

এরা ছাড়াও আছে কেউ কেউ। তারা রাজনীতি করেনা—তাদের বলা যায় ইন্‌টেলেকচুয়াল। সব সময়েই তাদের হাতে ফেরে ফেবার অ্যাণ্ড্ ফেবারের কোনো নতুন ইংরেজি কবিতার বই; হ্যামিশ হ্যামিল্‌টনের প্রকাশিত কোনো নতুন উপন্যাস অথবা শ্যাটো অ্যাণ্ড্ উইন্‌ডাসের কোনো নতুন সমালোচনা-সাহিত্য। সবাই সব পড়ে তা নয়—অনেকে জ্যাকেটে এসেই থমকে দাঁড়ায়। তবু এখানেও বিশ্বভারতীর একটি সোনার পদ্ম ঝলমল করে ওঠে বই কি।

আর অবশ্য লাইব্রেরী আছে। সেখানে কয়েকটি ছেলেকে ডুবে থাকতে

দেখেছে বইয়ের ভেতর—দেখেছে তপস্তার মধ্যে নিমগ্ন। ভাবী গোল্ড-মেডালিস্ট্ আর পিএইচ্.-ডি। তা ছাড়া বাকী সব—

—ডায়লেক্‌টিক্যাল্ পয়েন্ট থেকে যতক্ষণ না দেখছ, ততক্ষণ তর্ক করা বৃথা—নিচের একটি ছেলে চিৎকার করে উঠল। কনকেন্দু ওকে চেনে। খদ্দরের পাঞ্জাবী, খদ্দরের পায়জামা। কড়া ধাঁচের চেহারা—চোখে পুরু টার্টল ফ্রেমের চশমা। ইকনমিক্‌স্ ডিপার্টমেণ্টের ছেলে। মাঝে মাঝে ইউনিভার্সিটির লনে বক্তৃতা দেয় ঘুষি পাকিয়ে।

কনকেন্দু চোখ তুলে তাকিয়ে রইল। কলেজ স্ট্রীটে শীতের রোদ—গাঁদা ফুলের মতো রঙ; স্কোয়ারের ভেতরে বিদ্যাসাগরের স্ট্যাচুর নিচে ঝিমন্ত একটা চীনে বাদামওয়ালা। অনবিরল ট্রাম আর ডবল-ডেকারের আসা-যাওয়া। স্কোয়ারের রেলিঙে সস্তার স্লিওভার আর মাফলারের সমারোহ। একটা স্লিপওভার কিনলে হয় ওখান থেকে। মাঝে মাঝে বড় কষ্ট হয়—একমাত্র র‍্যাপার সম্বল করে সব সময়ে শীত কাটেনা। বেশি দাম হবেনা নিশ্চয়—এক টাকা পাঁচশিকের মধ্যেই পাওয়া যাবে। এ মাসের ট্যুশনের টাকা পেলে ভাবা যাবে কথাটা। পাইস্ হোটেলে চিংড়ির কালিয়া খাওয়ার বিলাসিতাটা দমন করতে হবে দিন কয়েকের জন্যে।

কিন্তু কলেজ স্ট্রীটে শীতের রোদ—গাঁদা ফুলের মতো রঙ, হঠাৎ মাতৃপিতৃহীন পূর্ববঙ্গের ছেলেটি নিজেকে একান্ত নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগল। একটা অপরিচিত—অনাত্মীয় পৃথিবী; কোনো মানুষকেই এখানে সহজ সাদা চোখে চেনা যায় না; যেন দেখাও যায়না ভালো করে। মনে হয়, মুখের ওপর একটা ঘষা কাচের মুখোস টেনে সবাই চলাফেরা করে—কথাগুলো ভেসে আসে বহু দূরান্তের পার থেকে। আটাত্তরের একের এ-তে যদি বা কোনোমতে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া যায়—এখানে প্রতি মুহূর্তে নিজেকে আশ্চর্য রকমের দীন বলে মনে হতে থাকে। চৈত্র পাত্র—এখানে সে প্রক্ষিপ্ত।

এই রোদের রঙ্। যে ঘরের ওপর কনকেন্দুর কোনো টান নেই—সেই ঘরই যেন এখন তাকে টানতে লাগল। মনে পড়ল, এই রোদের আল্পনা এখন আঁকা পড়েছে বালির চরে, বুনো হাঁস আর চখা-চখির পাখায় পাখায়,

পরিণত হোগ্‌লার ফলে, নীল্‌চে-হয়ে-আসা নিতল্‌ স্রোতের বাঁকা বাঁকা রেখায়। পৌষালি ধানের পশার নিয়ে চলেছে ভাউলি নৌকো, দাঁড়ের তালে গান উঠছে ঃ

ভিম্‌গেরামের নাও ভাসাইয়া
আমি তোমার বন্ধু এস্যাছি,
সুন্দরী !
আয়নাপরা চুড়ি এস্যাছি—
সুন্দরী !

এই রোদের রঙ্‌। মেঘ-গহীন হিজল গাছের তলায় পর পর তিনখানা নৌকোর নোঙর ফেলল কারা ? বেদে—পূর্ববঙ্গের ভাষায় 'বেবাজিয়া'র দল। আঁটো-শাঁটো করে নীলাম্বরী শাড়ি-পরা ওই যে সুঠাম দেহ কালো মেয়েটি একটু বাঁকা হয়ে লগি পুঁতছে, যার পিঠের লাল কাঁচুলির গ্রন্থির ওপরে এই রোদ জ্বলছে, একটু পরেই একটা ঝাঁপি নিয়ে সে বেরুবে গ্রামের পথে, ঘরে ঘরে হানা দিয়ে হাঁক তুলবে তীক্ষ্ণ মিঠে গলায় : আইলাম গো মা বিষহরির নামে—আদত বিষ-পাথর নেব মা ঠাইরেন ? নেবা নি কামরূপ-কামিক্ষার শিকড়-বাকড় ?

এই রোদের রঙ্‌। ইলিশ মাছের নৌকোগুলো মন্থর গতিতে ভেসে চলেছে—হঠাৎ কার জালে টান পড়ল। একটা মাছ ছটফট করছে। একখানা সোনার পাত যেন !

—আপনাকেই খুঁজছিলাম যে !

চমকে ঘুরে দাঁড়ালো কনকেন্দু। কলকাতা—আশুতোষ বিল্‌ডিঙের ব্যাল্‌কনি। নদীর জলে বেদের মেয়ের মুখে, চখা-চখির পাখায় সে রোদ এখানে ঝলকায়না।

কিন্তু যে ডাকছিল, সে কী করে জানল কনকেন্দুর মনের কথা ? সে রোদের একটুখানি ঝলক সেও যে বয়ে এনেছে। এনেছে তার চাঁপাফুলী রঙের শাড়িতে—তার এক ফালি উজ্জ্বল হাসিতে।

রূপশ্রী।

রূপশ্রী বললে, কদিন থেকেই ইউনিভার্সিটিতে আপনার খোঁজ করছি। দেখাই মেলেনা।

কনকেন্দু কয়েক মুহূর্ত আনমনা ভাবে তাকিয়ে রইল রূপশ্রীর দিকে। মুখ একটু রাঙা হয়ে এসেছে, কপালে দু এক বিন্দু ঘাম। চোখের পাতা দুটি একটুখানি আনত হয়ে এসেছে অতলান্ত কালো তারার ওপরে।

—কবে অ্যাড্‌মিশন নিলেন ?—কনকেন্দু ভীরুভাবে প্রশ্ন করলে।

—প্রায় দেড়মাস।

—ফিলসফি ?

—আর কী নেব বলুন ? আপনাদের মতো আর্ট সাব্‌জেক্টে তো আমার টেস্ট্‌ নেই।

এটা রূপশ্রীর বিনয়। ফিলসফিতে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছে বলেই নয়, কলেজ ম্যাগাজিনের ছাত্র-সম্পাদক কনকেন্দু এই মেয়েটির একটা ছোট গল্প পড়ে চমকে উঠেছিল। কিন্তু বড় বেশি লেখাপড়ায় ভালো রূপশ্রী। সাহিত্য-চর্চা করে সময় নষ্ট করার মতো অপর্যাপ্ত সময় তার নেই। রুচিও না।

—আমাকে খুঁজছিলেন কেন ?—হঠাৎ একটা অশোভন প্রশ্ন করে বসল কনকেন্দু। এবং, প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই একটা সলজ্জ অনুতাপে সংকুচিত হয়ে উঠল।

রূপশ্রীর রক্তিম মুখে আরো একটু রক্তিমা ছড়িয়ে পড়ল। রৌদ্রের রঙে বিকেলের ছোঁয়া লাগল যেন।

—দাদা বলছিল আপনার কথা।—মৃদু গলায় রূপশ্রী বললে, বলছিল একবার দেখা করতে।

দাদা—শঙ্করদা। একটা সশ্রদ্ধ আনন্দে কনকেন্দুর মন ভরে গেল। দীর্ঘকায় রোগা মানুষটি—অন্তর্মুখী দৃষ্টিতে তাকান। বছর তিনেক আগে এম-এ তে প্রথম হয়ে যখন দুমাসের জন্যে দেশে গিয়েছিলেন, সেই সময়ে কনকেন্দু তাঁর সাহচর্য পেয়েছিল। তারপরে কলকাতায় অধ্যাপনা নিয়েছেন তিনি।

কিন্তু কনকেন্দুকে তিনি ভোলেননি—আর কনকেন্দুর পক্ষে তাঁকে

তোলবার প্রশ্নই ওঠে না। একটা ইংরেজী উপমা দিয়ে বলা যায় 'ভরম্যান্ট ভলক্যানো।' অপরিচিত, অর্ধ-পরিচিতের কাছে আশ্চর্যভাবে তিনি মূক—চোখ তুলে মাঝে মাঝে তাকান কিন্তু সে দৃষ্টিতে যেন কোনো অর্থ থাকে না। তারপর যখন নিজের অভ্যস্ত ক্ষেত্রে ফিরে আসেন, নিজের আসর জমিয়ে বসেন তাঁর সিলেক্ট ফ্রেণ্ডস্‌দের ভেতরে, তখন অনর্গল ধারায় বেরুতে থাকে তাঁর বিশ্ব-সাহিত্য পরিক্রমা। ঘুমন্ত অগ্নিশিখর আত্মপ্রকাশ করে।

অথবা, সাহিত্য বললে ঠিক হয়না। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বায়োলজি, অ্যানথ্রোপলজি। লেটেস্ট বুক হ্যাবিট শঙ্করদার। পৃথিবীর প্রত্যেকটি পদক্ষেপ অনুভব করেন তিনি। ফ্রেঞ্চ জানেন, ল্যাটিনে দখল আছে, কিছু কিছু জার্মানের চর্চাও করেছেন। শঙ্করদার আসর যেন সমুদ্রস্নানের আনন্দ।

কিন্তু কী আশ্চর্য—পাশে এখনো যে রূপশ্রী দাঁড়িয়ে। শঙ্করদার কথাই ভাবছে, কিন্তু রূপশ্রীর কথার তো জবাব দেয়নি!

—নিশ্চয় যাব। এই সপ্তাহে যাব একদিন।

রূপশ্রী হাসল: ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলেন না—কী করে যাবেন?

—ঠিকানা দেবার দায়িত্ব তো আপনার।

—সে তো নিশ্চয়—রূপশ্রী তেমনি সীমিত হাসি হাসল: কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে আপনার তো তবু একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। এড়িয়ে যাওয়ার মতলব বুঝি? নিতান্ত বলবার জন্যেই বললেন?

কনকেন্দু বিব্রত বোধ করলে: কী আশ্চর্য, কি করে ভাবলেন এসব?

—ভাবাটা খুব অন্যায় বুঝি? আমাকে দেখে কি রকম বিপন্ন হয়ে উঠেছেন, আমি কি সেটা বুঝতে পারিনি? আচ্ছা সংক্ষেপেই ছুটি দেওয়া যাক আপনাকে—ব্লাউজ থেকে রূপশ্রী ফাউন্টেন পেনটা খুলে আনল, তারপর কালো চামড়ার ফাইলটা খুলে বড় বড় অক্ষরে লিখল ঠিকানাটা।

—বেশি খুঁজতে হবেনা আপনাকে। পার্ক সার্কাস ট্রাম ডিপো পেরিয়ে আমির আলী অ্যাভিনিউয়ের ডান দিকের রাস্তাটা।

সযত্নে ভাঁজ করে ছিঁড়ল কাগজটা, এগিয়ে দিলে কনকেন্দুর দিকে।

—কবে আসবেন, বলুন স্পেসিফিক্যালি। দাদার কাছে রোজ বকুনি খাই—অথচ একমাস ধরে আপনাকে খুঁজেই পাইনি আমি।

—রবিবার সকালে—আটটা সাড়ে আটটায়।

—মনে থাকবে?

—বড় বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে কিন্তু।

—সে সুযোগ তো আপনিই দিয়েছেন।—রূপশ্রী একটুখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল: তখন থেকে পাশ কাটাবার চেষ্টাই করছেন খালি। আচ্ছা, কথা রইল তা হলে—রবিবার—

একটা কিছু জবাব দেওয়ার চেষ্টা করলে কনকেন্দু, কিন্তু সুযোগ পাওয়া গেল না। তার আগেই পাশ থেকে সরে গেছে রূপশ্রী, লঘু জুতোর শব্দ তুলে পেছন ফিরে এগিয়ে চলেছে মেয়েদের কমনরুমের দিকে। গাঁদা ফুলের মতো রোদে রাঙানো একটুকরো মেঘ সামনে থেকে ভেসে গেল হাওয়ায়।

কনকেন্দু চুপ করে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। পাশ কাটাবার চেষ্টাই বটে। রূপশ্রী জানেনা—কিন্তু কখনো কি অনুভব করেনি? অনুভব করেনি পূর্ববঙ্গের সেই সুদূর শহরটিতে ওদের পড়ার ঘরটিতে বসে? কথা বলতে বলতে উঠে গেছেন শঙ্করদা: ও আর রূপশ্রী মুখোমুখি দুটি আসনে বসে পনেরো কুড়ি মিনিট সময় কাটিয়েছে অবিচ্ছিন্ন নীরবতায়; পাশের জানালা দিয়ে কনকেন্দু তাকিয়ে থেকেছে দূরে জোয়ারের দোলা লাগা নদীর জলে আর কান পেতে শুনেছে ঝাউবনের অশ্রান্ত স্বনন। তখনো কি কিছু মনে হয়নি ওর?

না হওয়াই ভালো। কিছু লাভ। কী হবে সে ভারটাকে মিথ্যে মনের মধ্যে বয়ে? কী লাভ হয়—আজও যখন কোনো একান্ত অবসরে নিজেকে নিয়ে সে বসে—তখন একটি শান্ত সুকুমার মুখ আশ্চর্য নিবিড় দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে তারই দিকে?

শঙ্করদার আকর্ষণের ভেতরেও এইখানেই বাধা। এত স্নেহ করেন শঙ্করদা, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও যদি আভাস পান যে সে মনে মনে—

সে লজ্জা রাখবার জায়গা নেই কনকেন্দুর—মাটির মধ্যে সে মিশে যাবে

তার আগে। কিন্তু রবিবার—সকাল সাড়ে আটটা! যাওয়া উচিত কি তার? হয়তো নিজের অজ্ঞাতেই কখন কেমন করে তাকাবে রূপশ্রীর দিকে, আর মুহূর্তে সেটাকে আবিষ্কার করে তীব্র চাপা গলায় শঙ্করদা ডাকবেন: কনক!

দোষ রূপশ্রীরই। ফিলসফিতে পড়ছে, কোনো দরকার ছিল না তার সঙ্গে দেখা করবার, যোগাযোগ ঘটাবার। শঙ্করদা বলেছিলেন, ভুলেও যেতেন দুদিন পরে। আর কলকাতায় চলে এসে কনকেন্দু মুক্তির নিশ্বাস ফেলেছিল—ভেবেছিল, আড়াইশো মাইল দূরে ঝাউবনের ছায়ায় সে পড়ার ঘরটি আর কখনো ফিরে আসবেনা।

কিন্তু কেন এই নিষ্ঠুর কৌতুক রূপশ্রীর? কিছু কি কখনো অনুভব করেনি? একেবারে কিছুই না?

—দেখুন দাদা—

আশুতোষ বিল্‌ডিঙে ব্যাং নেই, তা ছাড়া ব্যাং কথাও বলতে পারেনা মানুষের ভাষায়। সুতরাং আওয়াজটা যার গলা থেকে বেরুল, সে মানুষই বটে। আর বিশেষ করে সেই সহপাঠী ছাত্রটির—যে একটু আগেই হাই বেঞ্চের তলায় ক্যামেরা নিয়ে ডলি মিত্তিরের ছবি তুলছিল!

মুখে স্পষ্ট বিরূপতা নিয়ে কনকেন্দু জিজ্ঞাসা করলে, কী বলছিলেন?

ছেলেটি অন্তরঙ্গভাবে কাছে এগিয়ে এল। কেমন আপ্লুত গলায় বললে ওই মেয়েটি বুঝি আপনার বান্ধবী?

—হুঁ—কী হয়েছে তাতে?—কনকেন্দুর চোখ কঠোর হয়ে এল।

—কী সাব্‌জেক্টে পড়ে বলুন তো? কোন্ ইয়ার?

—হঠাৎ এত কৌতূহল কেন আপনার?

ছেলেটার মুখে একটা কুশ্রী তৈলাক্ততা ফুটে বেরুল: ইয়ে—মানে, আপনি দাদা লাকি ম্যান! শি ইজ্ রিয়্যালি এ প্রেটি মিস্! দিন না আলাপ করিয়ে—

রুক্ষ দৃষ্টিতে রুচিহীন ছেলেটার দিকে তাকালো কনকেন্দু।

—পর্দানসীন তো নয়। যান্ না—আলাপ করে নিন্।

ছোকরা থতমত খেল : দেখুন, ইয়ে—

—ইয়ে-টিয়ে কিছু নেই। মেয়েদের কমন রুমের বেয়ারার হাতে স্লিপ্ পাঠান —চলে আসবে এক্ষুনি।

পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার উপক্রম করতেই আবার নির্লজ্জ অনুনয় এল :

আহা-হা, চটছেন কেন ? চলুন না ইউনিভার্সিটি রেস্তোরাঁয়। এক সঙ্গে পড়ি, অথচ আলাপই হলনা ভালো করে। চলুন, চা খেতে খেতে গল্প করা যাবে।

—মাপ করবেন, অসময়ে আমার চা চলেনা।

—আপনি দাদা বড্ড বেশি রিজার্ভ ! একটু ফেলো-ফিলিং নেই ?—পোড়া তামাকের কটু গন্ধভরা মুখ আরো কাছে নামিয়ে আনল, একটা হাত অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে রাখল কাঁধের ওপর : চা না খান—কফি ? কোকো ? একটা সিগারেট ?

—ওর কোনোটাই আমার অভ্যাস নেই—বিরক্তিভরে হাতটা নামিয়ে দিয়ে কনকেন্দু পা বাড়াল তেতলার সিঁড়ির দিকে। দু পা এগোতেই পেছন থেকে শোনা গেল খাঁটি প্রাকৃত ভাষার স্পষ্ট সম্ভাষণ : শা—

—হোয়াট ?

তীরগতিতে ফিরে দাঁড়ালো সে। মুঠো হয়ে উঠল হাত : কী বললেন ?

—আমি ?—ছোকরা সভয়ে সরে গেল ব্যাল্‌কনির রেলিঙে : আমি তো কিছু বলিনি আপনাকে !

—ইন্‌ভার্টিব্রেট !—দাঁত চেপে উচ্চারণ করলে কনকেন্দু, ফিরে চলল লাইব্রেরির উদ্দেশ্যে। আর পরমাশ্চর্য—পেছনে সেখানেই দাঁড়িয়ে ছোকরা বিলিতী ফিল্মের গান ধরল : চিকা-চিকা-বুম্ !

চার

ফিরতে ফিরতে বিকেল। আটাত্তরের একের এ-তে ঢোকবার আগেই গাঙ্গুলীর দোকানের দিকে চোখ পড়ল। ঘুগনিটা প্রায় হয়ে এসেছে। হাওয়ায় হাওয়ায় সুগন্ধ ভাসছে তার। জিভে লালা জড়িয়ে আসে। বিহেভিয়ারিজম্।

খিদে চন্‌চন্ করে উঠল পেটের ভেতরে। এক কাপ চা খেয়ে ওঠা যাক ওপরে।

ঘুপচি ঘরের ভেতরটা ফাঁকা। বাইরে জীর্ণ একটা বেঞ্চি নামিয়ে দিয়েছে গাঙ্গুলী—তিন চারজন খরিদ্দার সেখানে বসেই চা-পান করছে। কনকেন্দু ভেতরে উঠে গেল।

না, ঠিক ফাঁকা নয়। আর একজন আছেন সেখানে। মদন শীল। তেমনি ঝিমুচ্ছেন চোখ বুজে। সামনে একটা চায়ের পেয়ালা।

ঘড়ঘড়ে গলায় ডাকলেন: গাঙ্গুলী?

—এই যে!—গাঙ্গুলী সাড়া দিলে।

—আর একটা হাফ্—

—দিচ্ছি।

বঙ্কু কেট্‌লি নিয়ে এল। কনকেন্দু লক্ষ্য করল, এবারে আর সে হাসছে না। বরং একটা ভীত দৃষ্টিই ফেলল মদন শীলের দিকে। বোধ হয় ভালো করে শাসিয়ে দিয়েছে গাঙ্গুলী। বুড়োর পেয়ালায় চা ঢেলে বঙ্কু এগিয়ে এল কনকেন্দুর কাছে।

—আপনার?

—মামলেট।

—ডবল?

—না, সিঙ্গ্‌ল।

বঙ্কু ওম্‌লেট করতে গেল। কনকেন্দু নীরবে বসে তাকিয়ে রইল মদন

শীলের দিকে। খালি মনে হতে লাগল, এ লোকটা একটা আত্মজীবনী লেখে না কেন? কন্‌ফেশন্‌স্ অফ্ এ ক্যাল্‌কাটা বাবু?

চায়ের পেয়ালা সামনে নিয়ে কিছুক্ষণ যেন ধ্যান করলেন মদন শীল। তারপর পকেটে হাত দিয়ে বের করে আনলেন ছোট একটি রূপোর কৌটো। সেটা খুলে ছোট একটি কালো বড়ি বের করলেন, টুপ করে ফেলে দিলেন মুখের ভেতরে।

আফিং? ওষুধ?

আস্তে আস্তে চোখ খুললেন মদন শীল। ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকিয়ে রইলেন ক্যালেণ্ডারের সিনেমা-স্টারটির দিকে। মুখে ধবলের মতো চুনের দাগটা চক চক করতে লাগল ম্লান আলোয়।

তারপর:

—গাঙ্গুলী?

—বলো।

—থিয়েটার-টিয়েটার হয়না আজকাল?

—হয় বই কি। আজকেও আছে। কেন, দেখবে নাকি?

—দুর দুর!—মদন শীল মুখ বাঁকালেন: ওকে আবার থিয়েটার বলে—না আছে অ্যাক্টর—না অ্যাক্টিং!

গাঙ্গুলী মৃদু প্রতিবাদ করলে, শিশির ভাদুড়ী তো রয়েছে।

—শিশির! ছোঃ!—মদন শীল ফস্ করে একটা বিড়ি ধরালেন: শিশির তো সেদিনের ছোকরা। সেই বছর কয়েক আগে বড়দিনের এক্‌জিবিশনে ইডেন গার্ডেনে প্লে করতে নামল ডি-এল্ রায়ের 'সীতা' নিয়ে। তা রামের পার্ট ছোক্‌রা করেছিল মন্দ নয়। কিন্তু দানীবাবুর কাছে? ছোঃ—কিচ্ছু না।

—এ তুমি বাড়িয়ে বলছ দাদা!

—বাড়িয়ে বলছি? তোমার মনে নেই গাঙ্গুলী? সেবার মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশের সিরাজদ্দৌলা নামালে। সিরাজ সাজলে দানীবাবু, করিম চাচার পার্ট করলে গিরিশ নিজে, মুস্তফি সায়েব সাজলে দানশা! কী এ্যাক্টিং! যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল! তারাসুন্দরী নেমেছিল জহরা

হয়ে, বেগম সেজেছিল সুশীলা। অমন আর হবে না, না হয়েছে কোনোদিন?

—কিন্তু এরাও তো—গাঙ্গুলী আবার মাঝখানে ফোড়ন কাটল। ঠিক কী চায় গাঙ্গুলী? প্রতিবাদ করতে? না—এক একটা মৃদু আঘাত দিতে চায় মদন শীলকে উত্তেজিত করে তুলতে? তারই মুখ দিয়ে হারানো কলকাতার স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলে বুঁদ হয়ে যেতে চায় তার ভেতরে?

—এরা? ছাড়ান দাও—ছাড়ান দাও! দানীবাবুর যোগেশ মনে আছে? 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল—'এখনো হু হু করে ওঠে বুকটা। কী সব থিয়েটার! মিনার্ভা, স্টার, মনোমোহন, ক্লাসিক, কোহিনূর! আর তেমনি সব বাঘা অ্যাকটার-অ্যাকট্রেস্। রাতের পর রাত বক্সে বসে থিয়েটার দেখতুম—মাতাল হয়ে যেতুম। গিরিশ, দানীবাবু, অর্ধেন্দু মুস্তফি, অমৃত বোস, অমৃত মিত্তির, অমর দত্ত, ক্ষেত্তর বাবু, তারক পালিত! ওদিকে তিনকড়ি, সুশীলা, হরিসুন্দরী, তারা, প্রমদা। রূপে ঝল্‌মল্‌ করত। এখনকার অ্যাকট্রেসরা পায়ের ধুলোরও যুগ্যি নয় তাদের!

—তোমার খালি পিছুটান মদনদা। এখানকার কিছুই তোমার ভালো লাগেনা। হালের থিয়েটার তো আর দেখনা কোনোদিন—

—দেখব কী—দেখবার আছে কী!—এক চুমুকে তলানীশুদ্ধু হাফ্ কাপ শেষ করলেন মদন শীল: সকলের পাল্লায় পড়ে একবার দেখতে গেলুম মিশরকুমারী। থুঃ—ওর নাম থিয়েটার! সেই তখনকার দিনের কুঞ্জ চক্কোত্তির আবন আর প্রিয়নাথ ঘোষের সামন্দেশ! আগুন—আগুন! লোকে এম্‌নি থ মেরে যেত যে ক্ল্যাপ্ দেবার কথা পর্যন্ত মনে থাকত না! হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

আচমকা একটা বিকৃত অট্টহাসি হাসলেন মদন শীল। চমকে চেয়ার থেকে পড়তে গিয়ে সাম্‌লে নিলে কনকেন্দু, মদন আবনের পার্ট করছেন সুর টেনে: হাঃ—হাঃ—হাঃ! সামন্দেশ, এই তোমার কন্যা! করো—একে তপ্ত তৈল-কটাহে নিক্ষেপ করো—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

ওম্‌লেট নিয়ে আসতে আসতে থমকে গিয়েছিল বকু। হাসিটা বন্ধ হলে

একবার সন্দিগ্ধ চোখে মদনের দিকে তাকিয়ে কনকেন্দুর সামনে প্লেটটা নামিয়ে দিয়ে গেল।

গাঙ্গুলী প্রশান্ত ভৎর্সনায় বললে, কী হচ্ছে ?

—না, এম্‌নি মনে পড়ে গেল !—ঠোঁটের কোণায় কোণায় জমে ওঠা থুথুর ফেনা ধুতির কোঁচায় মুছে ফেললেন, মদন শীল : যেন চোখের সামনে দেখছি আজো।—তারপর আস্তে আস্তে গলা নামালেন : আরে, এখন থিয়েটার কানা হয়ে যাবে না তো কী। সে রকম চটকদার মেয়ে আসবে কোত্থেকে ! সেকালে বড় বড় বাঈজীকে বাইরে থেকে এনে পুষত বাবুরা—পুষত রাজা রাজড়ার দল ! তাই এক একটা মেয়েও জন্মাত যেন উর্বশী ! যেমন রূপে, তেমনি নাচে-গানে। আর এখন ? যত সব—

অত্যন্ত অশ্লীল ভাষায় বক্তব্যের বাকী অংশটুকু পেশ করলেন মদন শীল। শুনে কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল।

—চা খাওয়া হয়েছে তো বুড়ো ?—ছদ্ম ক্রোধে গাঙ্গুলী বললে, এবার বেরোও দেখি আমার দোকান থেকে। তোমার জ্বালায় কি শেষে ভদ্দর লোক আমার দোকানে এসে বসতে পাবেনা ?

—ইস্ ?—মদন শীল মুখ ভ্যাংচালেন : হালে তো খুব ভদ্দরলোক হয়েছে দেখছি ! আচ্ছা ইয়ার—উঠি তা হলে !

সত্যিই উঠে দাঁড়ালেন। চটলেন কিনা ঠিক বোঝা গেল না, মৃদু পায়ে বেরিয়ে গেলেন দোকান থেকে। তারপর ফুটপাথ ছাড়িয়ে তিনি বড় রাস্তায় নেমে গেলে বকু আর থাকতে পারল না।

—মাইরি—দাদু ভারী মজার লোক !—খিল্‌খিল্ করে বকু হেসে উঠল।

—মজার লোক !—গাঙ্গুলীর চোখ হঠাৎ দপ্ করে উঠল : চুপ কর বলছি !—তীব্র ধমক দিয়ে বললে, নিজের কাজ কর তুই।

আত্মিক সংযোগ। মদের সমুদ্রে, অতীতের কলার মান্দাসে ভেসে চলেছে মদন শীলের শব দেহ। একটা অতন্দ্র প্রহরীর মতো সেই শবকে পাহারা দিচ্ছে গাঙ্গুলী। বকুর মতো কাক-শকুনের ঠোকরানি সে সইতে পারবে না।

ওমলেট থেকে একটা কাঁচা লঙ্কার টুকরো চামচে দিয়ে ছাড়াতে ছাড়াতে কনকেন্দু ভাবল।

এক কাপ চা এনে সামনে রাখল বকু।

গাঙ্গুলীর দোকান থেকে মদন শীলের কথাই ভাবতে ভাবতে কনকেন্দু উঠে এল দোতলায়। গোকুল-নকুল ঘরে নেই। বৈরাগীর মতো চেহারা —তোবড়ানো ভাঙা গাল এক বুড়োকে তীব্র স্বরে কী যেন ভৎর্সনা করছে সুদাম। বুড়ো তাকিয়ে আছে গোরু-চোরের মতো করুণ ভঙ্গিতে। নিজের মাদুরে বসে সকৌতুকে আলোচনা শুনছে যতীন—কনকেন্দুকে ঢুকতে দেখে ঠোঁটে আঙুল দিলে।

নীরবে নিজের জামাটা খুলতে খুলতে কনকেন্দু শুনতে লাগল সুদামের গর্জন।

—তোমাকে আমি কতবার বারণ করেছি এখানে আসতে। তবু কেন এসেছ? আর এক পয়সাও আমি তোমাকে দিতে পারবনা।

—হেই সুদাম—রাগ কোরোনা সুদাম—বুড়োর মিনতি।

—না, তোমার পা পূজো করব! গুণের তো আর ঘাট নেই তোমার! যাও—যাও—উঠে পড়ো এখান থেকে। বেশি চালাকি কোরোনা বলে দিচ্ছি!

—অ সুদাম, লক্ষ্মী সুদাম—

—ধ্যাত্তোর—! তোমার লক্ষ্মী সুদামের নিকুচি করেছে! গুণে গুণে তিনশোটি টাকা দিয়েছি তখন। লজ্জা করলনা আমার টাকা দিয়ে নিজে বিয়ে করতে? আবার কোন্ মুখে আমার চৌকাঠ মাড়াও তুমি?

—হেই সুদাম, না খেয়ে মরে যাচ্ছি—

—মরো না! তুমি আর তোমার বউ গলায় দড়ি দিয়ে মরো। আরো তাড়াতাড়ি হবে—বেঁটে মুগুরের মতো সুদাম তড়াক করে উঠে পড়ল: আমার কাজ আছে এখন, আমি যাচ্ছি।

—ও সুদাম, শোনো—

—শোনবার কিছু বাকী নেই—বিস্তর শুনেছি!—সুদাম চৌকাঠের বাইরে

গিয়ে জুতো খুঁজতে লাগল। মরিয়া হয়ে বুড়োও তার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

—এইবারে দশটা টাকা দাও। দিব্যি গেলে বলছি, এক মাসের ভেতরেও আর আমি আসবনা—

—এক পয়সাও দেবনা। আর এক মাস কেন, কোনো দিনই তোমাকে আর আসতে হবে না—সুদাম হন্‌হনিয়ে রওনা হল সিঁড়ির দিকে।

—হেই সুদাম—লক্ষ্মী 'সুদাম—শোনো না সুদাম—

বিলীয়মান জুতোর শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বুড়োর মিনতিও মিলিয়ে আসতে লাগল।

একটা পায়রার পালক ।দয়ে কান চুল্‌কোতে চুল্‌কোতে পুতিতুণ্ডি অভ্যস্ত মিটি মিটি হাসল: ধরেছে যখন, কিছুতেই ছাড়ছে না পাল মশাইকে। অনেকবার দেখলাম তো! নিদেন পক্ষে পাঁচ সিকে পয়সাও আদায় করে নেবে!

—কে ও? পাওনাদার নাকি?

—পাওনাদারের বাপ। মানে সুদামের বাপ।

—অ্যাঁ!—কনকেন্দু আকাশ থেকে পড়ল: সত্যি বলছেন?

—তবে কি গল্প?—যতীন পুতিতুণ্ডি মন দিয়ে পায়রার পালকটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগল: গল্পের চাইতে জীবনটা ঢের বেশি তাজ্জব মশাই! হাঁ, হাঁ, আদত বাপ, ধর্মবাপ নয়!

—কিন্তু বিয়ে—তিনশো টাকা—

—শুনলেন তো? ওইটিই হল আসল খেল্। নিজের বিয়ের জন্যে সুদাম বাপকে তিনশো টাকা পাঠিয়েছিল। ওদের সমাজে আবার পয়সা দিয়ে কনে কিনতে হয় কিনা। তা ছেলের জন্যে মেয়ে দেখতে গিয়ে বাপই চিৎপটাং। সুদামের টাকাটা বিলকুল হজম করে আর মেয়ের বাপকে কী সব ভুজুং ভাজুং দিয়ে নিজেই বিয়ে করে বসেছে! ফলে, সুদাম ফায়ার! বাপকে দু চোখে দেখতে পারেনা, আমরা সামনে না থাকলে দু চার ঘা হয়তো মেরেই বসত কোন্‌দিন। বুড়োও মশাই আচ্ছা হ্যাংলা! চড়-চাপড় খেলেও

ছাড়বে না! ওই যে বললাম না? নিদেন পক্ষে পাঁচ সিকের পয়সাও আদায় করে তবে নড়বে!

কনকেন্দু বজ্রাহত হয়ে বসে রইল। জীবন! কত জটিল—কত ভয়ঙ্কর।

যতীন বললে, যেতে দিন ওসব। তা আমার হ্যাণ্ডবিলের কী হল?

—কাল পরশুর মধ্যেই করে দেব।

—একটু তাড়াতাড়ি, বুঝলেন না? মেলা কম্পিটিটার আজকাল। একটু ভালো পাবলিসিটি না দিতে পারলে আর জুৎ হচ্ছে না! এ মাসে আবার যাদবপুরে কিছু বেশি টাকা পাঠাতে হবে—যতীন পুতিতুণ্ডির প্রসন্ন মুখ হঠাৎ মেঘের ছায়ায় কালো হয়ে উঠল।

—যাদবপুরে কে থাকে? আপনার ফ্যামিলি?

—না।—যতীন হাসল, কিন্তু হাসিটা নিষ্প্রাণ: সে অনেক কথা। বলব আর একদিন। গরীবের দুশ্চিন্তার কি আর শেষ আছে! কী করে যে চলে —কথার মাঝখানেই সে থেমে গেল। ঘরের আলোতে অত্যন্ত করুণ দেখাতে লাগল তার মুখ, কপালে ছোরার দাগটা তেমনি মেঘের মতো পুঞ্জিত হয়ে রইল।

কনকেন্দু জামা বদলালো। বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে পা ফেলল।

—বেরুচ্ছেন?—যতীনের জিজ্ঞাসা শোনা গেল।

—হাঁ—ছাত্র পড়ানো আছে।

—আমার হ্যাণ্ডবিলের কথা কিন্তু ভুলবেন না। আজ কালের মধ্যেই—

—সে ঠিক লিখে দেব।—কনকেন্দু দরজার বাইরে পৌছল। একবার ঘরের দিকে চোখ পড়তে দেখতে পেল, ইলেকট্রিক বাল্‌বটার দিকে দৃষ্টি মেলে কেমন উদ্‌ভ্রান্ত ভাবনায় মগ্ন হয়ে আছে যতীন পুতিতুণ্ডি।

পাঁচ

ছাত্র পড়িয়ে যখন সে মেসের দিকে রওনা হল, তখন রাত সাড়ে আটটার কাছাকাছি। যে পথ দিয়ে তাকে শর্ট কাট করতে হয়, তিনমাস আগে সে পথের ছায়া মাড়ানোর কল্পনাও সম্ভব ছিলনা তার পক্ষে। কিন্তু গঙ্গার ওপারে কালো কালো কলগুলোর আড়ালে সূর্য ডুবে গেলে এ অঞ্চলের চারপাশে যে জীবন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ হয়ে আসে, নিজের অজ্ঞাতেই মন তার সঙ্গে রফা করে নিয়েছে। মানিয়ে নিতে হয়েছে সমাজের নীচুতলার সঙ্গে। পথের দু ধারে সার দিয়ে যারা দাঁড়িয়ে থাকে, এখন তাদের মনোহারী দোকানের একরাশ সাজানো খেলনা ছাড়া কিছুই মনে হয়না আর।

তবু তাড়াতাড়ি পথটা পার হয়ে আসতে হয়। মাথা নীচু করে—যথাসম্ভব দ্রুত পায়ে। দুপাশের বাড়ি থেকে ঘুঙুরের আওয়াজ কানে আসে, গানের সুর শোনা যায়। মুখে একটা রুমাল চাপা দিয়ে সুট্ করে একটা দরজার মধ্যে হয়তো ঢুকে পড়ে পনেরো-ষোলো বছরের একটি ছেলে। ছাত্র খুব সম্ভব। জাতির ভবিষ্যৎ।

দোষ কাকে দেবে? সমস্ত সমাজটাতেই যেখানে পচন ধরেছে, সেখানে ঘায়ের একটা বীভৎস রূপ দেখে চমকে উঠে কোনো লাভ নেই। মৃত্যুমুখী সমাজ নিজের চূড়ান্ত অপমানকে এইখানে তুলে ধরেছে—বিকৃতির দুঃস্বপ্নে, নেশা-বিজড়িত বিহ্বলতায়। কুপিনের অশ্রুসিক্ত 'ইয়ামা দি পিট' মনে পড়ে: "I dedicate this book to mothers and youths—"

বড় রাস্তায় উঠে এল। কিন্তু এখানেও মুক্তি নেই—এ সেই প্রেতপুরীর শহরতলী। এখানেও মাঝে মাঝে রোয়াকের আবছা অন্ধকারে অভিশপ্ত সমাজের মাতৃত্বহীন মা—কলঙ্কচিহ্নিতা কন্যকা—নির্বাসিতা জায়া। আবর্জনার দুর্গন্ধে আমন্ত্রিত মাছির পালের মতো সন্ধানীচক্ষু বিলাসীর দল; যারা ভীরু, তারা আড়চোখে তাকিয়েই চলে যাচ্ছে। কিন্তু মনের অগোচর তো পাপ নেই।

এ ধারের একটা দোকানে পল্‌তার বড়া—খোসা শুদ্ধ্‌ লাল টকটকে চিংড়ি মাছ ভাজা। একটা লোক ঠোঙা ভরে সেইগুলো কিনছে। লোকটার চোখ নেশায় জড়ানো, সংগ্রহ করছে মদের চাট্‌। হঠাৎ আলোয়-ভরা এই পথটা —কলকাতার বড বড় বাড়ি—এত অসংখ্য লোক—সব মিলে একটা প্রাগৈতি-হাসিক অরণ্যের মতো মনে হয়: চারদিকে হিংস্র জীবনের আদিম উল্লাস চলেছে, একটু অসতর্ক হলেই সেও একটা ক্ষুধার্ত জন্তুর মুখের ভেতরে গিয়ে পড়বে। যে কোনো মুহূর্তে, যে কোনো দুর্বলতায়।

কুপ্রিনের ইয়ামার ওপর একদিন শেষের যবনিকা পড়েছিল। এখানে কি কোনোদিন তা পড়বেনা? এই অভিশাপ কি মুছে যাবেনা একদিন—এমন কি, ইতিহাসের পাতা থেকেও না?

মেস-বাড়িটায় ঢুকে সিঁড়ির সামনে পা দিয়েই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। শ্যামাদাসের হোটেলে আলো জ্বলছে। মাথার চারদিকে একটা ফেট্টি জড়িয়ে ডালে কাঁটা দিচ্ছে কুঞ্জলাল; একতম ঠাকুর পরিবেশন করছে ক্ষুধিতদের, শ্যামাদাস তার জায়গায় বসে অভ্যস্ত নিয়মে চচ্চড়ি আর ঝোলের হিসেব লিখছে, আর যাকে নিয়ে এত কাণ্ড, সেই ত্রিশ-বত্রিশ বছরের গোলগাল ফর্সা মেয়েটি নিরুদ্বিগ্ন মুখে ভাত সাজাচ্ছে পেতলের থালায় থালায়।

আশ্চর্য!

সকালের অমন খুনোখুনি পর্বের পরে কী করে এত সহজে সন্ধি হয়ে যেতে পারে, কনকেন্দু ভেবে পেলনা। যতীন পুতিতুণ্ডির লোক-চরিত্র বিলক্ষণ জানা আছে দেখা যাচ্ছে। কিংবা গোকুলবাবুর কথাই ঠিক—'অরা সব কেরেক্‌টার লেস্‌!' কোনো চরিত্র নেই বলেই একটা চূড়ান্ত মারামারি পর্যন্ত করতে পারেনা, একটু পরেই আপোস করে নেয়।

কেমন একটা ঘৃণা বোধ হতে লাগল। এতদিন এ হোটেলে নির্বিকার মুখেই খেয়ে এসেছে; কিন্তু আজ থেকে ওখানকার ভাত আর তার গলা দিয়ে গলতে চাইবেনা।

ওপরে উঠে দেখলে, চিৎকারে আর কান পাতা যায়না।

কিন্তু ঝগড়া নয়—তর্ক। চলছে সুদাম পাল বনাম গোকুলবাবুর মধ্যে।

বাপকে পাঁচ সিকে পয়সা দিয়ে হয়তো মনে মনে উত্তেজিত আছে সুদাম। নকুল অবশ্য সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেনি, কিন্তু মাঝে মাঝে দাদার সপক্ষে এক একটা টিপ্পনি কাটছে সুদাম পালকে লক্ষ্য করে। যতটা অনুমান করা গেল, তর্ক শুরু হয়েছে পূর্ববঙ্গ আর পশ্চিমবঙ্গের তুলনামূলক উৎকর্ষ নিয়ে।

—খাইতে জানেনি ঘটিরা? খাইবো ক্যাবল বিউলির ডাইল আর বাটি চচ্চড়ি!

—আর বাঙাল?—সুদাম বেঁটে-খাটো হলেও গলায় সে বাম্মাকণ্ঠ গোকুল-বাবুকে ছাড়িয়ে গেল: বাঙালে খায় শুঁটকি মাছ। তার গন্ধে তিন মাইল দূর থেকে বমি আসে।

যুক্তি কারোই প্রমাণ-সাপেক্ষ নয়, নিছক উক্তির জন্যেই গলাবাজী। তবু গোকুলবাবু দমে গেলেন,—কারণ শুঁটকি মাছের প্রতি তাঁর আসক্তিটা কোনো দুর্বল মুহূর্তে ইতিমধ্যেই তিনি প্রকাশ করে ফেলেছিলেন।

—আর গুগ্‌লি মাছ খায় কারা?—নকুল জানতে চাইল নিরীহের মতো।

সবে আরম্ভ, এর পরে তর্ক সুরেন বাঁড়ুয্যে আর দেশবন্ধুকে নিয়ে টানাটানি করবে। কনকেন্দুর এ অভিজ্ঞতা অনেকবার হয়েছে। মৃদু হেসে জামাটা খুলে দড়ির ওপর রাখতে রাখতে বললে, কী ছেলেমানুষি হচ্ছে—একশো বছরের পুরানো তর্ক! থামুন এবার।

দুজনের বিপক্ষে পড়ে একা সুদাম পাল বিব্রত বোধ করছিল। এবার যেন আশ্রয় পেল একটা: এই যে মশাই কনকবাবু, আপনিই বলুন।

—আমি আর কী বলব?—মাদুরটা টেনে নিয়ে স্মিত হাসিতে কনকেন্দু বসে পড়ল: আমার সাক্ষীর এখানে কোনো দাম নেই। আমিও তো বাঙাল—একেবারে ঘোর বাঙাল!

—তা হোক, তা হোক। আপনি শিক্ষিত লোক, আপনার বিবেচনা আছে। বলুন, বাঙালিকে বড় করেছে কে? দেশের সেরা মানুষ সব কারা? তারা ঘটি না বাঙাল?

—বাঙালরা সব অ্যাডুকেটেড্, বাঙালের পোলাপানেরা সব জুইয়েল

কনকবাবু আর নতুন কথা কইবো কী?—গোকুলবাবু সগর্বে আলোচনাটার সমাপ্ত করতে চাইলেন।

—তা বটে!—সুদাম পাল ব্যঙ্গের হাসি হাসল: আপনিই তো চোখের সামনে রয়েছেন। একেবারে অ্যাডুকেটেড জুইয়েল! কনকবাবুর আর বলবার কী আছে!

তর্কটা ব্যক্তিগত আক্রমণের বাঁক নিচ্ছে, এর পরে বাহুবল পর্যন্ত গড়াতে পারে। বলা যায় না, হয়তো সুদামের পিতৃ-প্রসঙ্গও তুলে বসতে পারেন গোকুলবাবু। সুতরাং এইখানেই ব্যাপারটাকে থামিয়ে দেওয়ার একটা নৈতিক প্রয়োজন অনুভব করলে কনকেন্দু। আর কিছু না হোক, অন্তত আত্মরক্ষার তাগিদেও। অগত্যা মুখ খুলতে হল।

—এসব আলোচনার কোনো মানেই হয় না।—কনকেন্দু একটা উচ্চাঙ্গের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চাইল: পূর্ববঙ্গ হল কর্মশক্তি, আর পশ্চিমবঙ্গ হল মস্তিষ্ক। হাত না থাকলে মাথার কোনো মানে হয়না। তাই দুটোই দরকার।

বিদগ্ধ-জনের আসরে পূর্ব বাংলা পশ্চিম বাংলার এই অপরূপ তত্ত্ব-ব্যাখ্যা করলে দু পক্ষের কাছ থেকেই কিলঘুষি খেতে হত, এ কথা কনকেন্দু জানে। কিন্তু আটাত্তরের একের এ-তে সন্ধি ও শান্তি স্থাপন করার পক্ষে এর বেশি আর দরকার হয়না। শিক্ষিত মানুষের মুখের কথা শুনলেই এখানকার সাধারণ মন শ্রদ্ধায় বিনীত হয়ে আসে, তার ওপরে কথাগুলো যদি গম্ভীর চালের হয়, তা হলে তো আর কোনো প্রশ্ন থাকে না।

অতএব সর্বাগ্রে গোকুলবাবুই খুশি হয়ে উঠলেন: শুইন্‌ল্যা তো হে সুদাম? অ্যাডুকেটেড্ ম্যান—এক কথায় কেমন পরিষ্কার কইর‍্যো বুঝাই দিলেন! আমরা হইলাম হাত—তোমরা মাথা—ব্যাস—চুইক্যে গেল সমস্ত।

কিন্তু বিজয়গর্বে সুদামের চোখ পিট পিট করতে লাগল: কিন্তু হাত বড় না মাথা বড়?

নকুল বললে, হাত দিই গলা টিইপে ধইরল্যে—মাথার দফা রফা কইর‍্তে কতক্ষণ?

—আরে মোক্‌লা, চুপ করস্‌নিরে?—গোকুলবাবু ধমক দিলেন: কনকবাবুই

তো মিটমাট কইর্য়ো দিলেন, আবার তর্ক করস্ কিয়ে রে ? ল—খুব হইছে। খাইবা নি সুদাম ? চল, এক লগে যাই।

সুদাম সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো : হাঁ, চলুন। নীচের হোটেলটা তো খুলেছে এ বেলা।

নির্বাক দৃষ্টিতে কনকেন্দু তাকিয়ে রইল। নিজের ওপরে শ্রদ্ধা জাগছে তার। একেবারে গুরুবাক্যের মতো একটি কথাতেই সে সমস্ত বিরোধের একটি মসৃণ নিষ্পত্তি করে ফেলল ! তা ছাড়া আরো একটা কারণ আছে বোধ হয়। পাইস্ হোটেলের শ্রীক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ দু'জনেরই সমান দশা ! সেখানে রান্নায় একটা সর্বভারতীয় স্বাদ আছে—এমনকি আন্তর্জাতিকও বলা যায়। ডালে এক-আধটা চৈনিক আরসোলারও দর্শন মেলে। জুলুদের খাদ্য পিঁপড়ে তো আছেই।

গোকুলবাবু ডাকলেন : খাইতে যাইবেন না কনকবাবু ?

র‍্যাপারটা টেনে কনকেন্দু এলিয়ে পড়েছিল। চোখ বুজে বলল, একটু পরে যাব—আপনারা যান।

ওঁরা তিনজন বেরিয়ে গেলেন। এখন সে একা। যতীন পুতিতুণ্ডি এখনো ফেরেনি—ব্যাণ্ডেলে না ব্যারাকপুরে তার আশ্চর্য তিল তেল আর বাতের ওষুধ বিক্রী করে বেড়াচ্ছে—কে জানে ! হয়তো অনেক রাত ফিরবে, হয়তো আজ আদৌ ফিরবে না।

কিন্তু রূপশ্রী। চোখ বুজে কনকেন্দু ভাবতে লাগল : রূপশ্রী ! এক কলেজে এক সঙ্গে পড়েছে বটে, কিন্তু কলেজের আইনে ছেলে-মেয়েদের মেশা-মেশির উপায় ছিল না। দূর থেকে অনেকের মধ্যে রূপশ্রীকে সে দেখেছে, ভালো ছাত্রী বলে খ্যাতি শুনেছে, কিন্তু কোনদিনই তার কাছে আসতে পারবে—এ কথা কখনো মনে হয়নি।

তার জন্যে দায়ী শঙ্করদা।

ব্যাপারটা ঘটেছিল ছোট একটি সাহিত্য-বাসরে। আরো দু' একজন বক্তার সঙ্গে সাহিত্য-সম্বন্ধে দু'চার কথা আলোচনা করেছিল কনকেন্দুও। কলেজী ছাত্রের স্বল্প-পঠিত পাণ্ডিত্য নিয়ে সে বিশ্ব-সাহিত্যের একটা পরিক্রমা

করার চেষ্টা করেছিল। বার্ণার্ড শ, বার্ট্রাণ্ড রাসেল থেকে বোদলেয়ার কামিংস আর্লেন কাউকে সে বাদ দেয়নি। কেমন ধারণা হয়েছিল, অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছে সে।

সভাপতি ছিলেন একজন প্রবীণ উকীল—শহরের হরিসভার সেক্রেটারী তিনি, নীলাম-ইস্তাহারে আকীর্ণ একখানা স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনাও তিনি করেন। শহরের জলাভাব আর হরিলীলাতত্ত্ব নিয়ে লেখেন সম্পাদকীয়। টাক চুলকে তিনি বললেন, তরুণ কনকেন্দু যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা দেখে আমি স্তম্ভিত। এই অল্প বয়সেই তিনি যে অসামান্য প্রতিভার অধিকারী হয়েছেন তাতে ভবিষ্যতে একদিন তিনি নির্ঘাত একটি মহীরুহ হয়ে উঠবেন। যদিও তাঁর বক্তৃতার সবটা আমি ভালো করে বুঝতে পারিনি, তবু আমার মনে হচ্ছে, তাঁর যুক্তিগুলো যেমন সারবান; তেমনি ধারবান। কারণ, তিনি অনেক বিলিতী বইয়ের নামোল্লেখ করেছেন।

প্রচুর করতালি নিয়ে স্ফীত মনে কনকেন্দু বাড়ি ফিরছিল। এমন সময় ডাক এল : শুনুন ?

কনকেন্দু থেমে দাঁড়ালো। তার একটু পেছনেই আর একটি মানুষ হেঁটে আসছেন। বয়সে তার চাইতে কিছু বড়—মাথায় অনেকখানি লম্বা। গায়ে বোতাম-খোলা পাঞ্জাবী, পায়ে এক জোড়া বিদ্যাসাগরী চটি। দু' চোখে আচ্ছন্ন দৃষ্টি—যেন ঘুমভরা চোখে ভদ্রলোক তার দিকে তাকিয়ে আছেন। মনে পড়ল, সভাটার একেবারে সর্বশেষ প্রান্তে লোকটিকে নীরবে বসে থাকতে দেখেছিল সে।

আরো খানিকটা অভিনন্দন প্রত্যাশা করে কনকেন্দু দাঁড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু ভদ্রলোক যা বললেন, তা নীল আকাশ ফুঁড়ে বজ্র পড়ার মতো। কাছে এগিয়ে এসে কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, এত বাচালতা করেন কেন ?

কনকেন্দু স্তম্ভিত। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে। লোকটি আত্মীয়ের মতো সস্নেহে তার কাঁধে হাত রাখলেন : আপনার বুদ্ধি আছে, কথা বলতেও পারেন মন্দ নয়। কিন্তু ধারালো তলোয়ার দিয়ে গোরুর জাবনা কাটছেন কেন ?

কনকেন্দু বিবর্ণ হয়ে গেল : ঠিক বুঝতে পারছি না আপনার কথা।

লোকটি বললেন, বোঝাবো বলেই এখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি আপনার অপেক্ষায়। একবার ভেবেছিলাম সভাতেই বক্তৃতার প্রতিবাদ করব, কিন্তু আপনার বুদ্ধি আর তীক্ষ্নতা আমার বড় ভালো লাগল। তাই পথেই আপনার সঙ্গে আলোচনা করে নিতে চাই।

—বেশ তো কী বলবেন, বলুন।—সভয়ে কনকেন্দু ঠোঁট চাটল একবার।

চলতে চলতে ভদ্রলোক বললেন, যে দেশে লোকে জ্যাকেট পড়ে বই সম্বন্ধে অথরিটি হয়, অন্যের তোলা কোটেশন দিয়ে বিদ্যে জাহির করে, এক আঁজলা ডোবার জল নিয়ে বলে সমুদ্রকে মুঠোয় ধরেছি—সেখানে এরকম বক্তৃতা অত্যন্ত উপাদেয়। কিন্তু যার বুদ্ধি আছে, হয়তো শক্তিও আছে, তাকে এম্‌নি ভাবে লোক ঠকাতে দেখলে কষ্ট হয়। বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে কেন একবার ভালো করে বুঝতে চেষ্টা করেননা? অন্ততঃ পড়ে নেন্‌না দু চার পাতা?

কনকেন্দুর কান লাল হয়ে উঠল। একটা ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ গজরে উঠল গলার নিচে, কিন্তু সেটাকে সে বাইরে প্রকাশ করতে পারলনা। শুধু লোকটির হাত ছাড়িকে কী করে পালাবে, সেই চিন্তাই সে করতে লাগল। এমন একটা বিশ্রী ফাঁদে পড়বে জানলে কখনো তাঁর ডাকে সাড়া দিত না সে।

কিন্তু পালানো আর হলনা। ভদ্রলোক কথা কইতে আরম্ভ করেছেন। গম্ভীর সুরেলা গলায় সুন্দর উচ্চারণে তারই আলোচনাটার সূত্র ধরে ব্যাখ্যা করছেন তিনি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল কনকেন্দু—যেন স্বপ্নঘোরে লোকটিকে অনুসরণ করে সে চলতে লাগল। আজ সত্যি সত্যিই সমুদ্রস্নান করছে সে। গভীর—অতলস্পর্শ। পড়ুয়া ছাত্রহিসেবে সর্বজন প্রতিষ্ঠিত অহমিকাটা কখন যে তার গুঁড়ো হয়ে মিলিয়ে গেছে, নিজেও সে তা টের পায়নি!

যখন তার চটকা ভাঙল, তখন ভদ্রলোক বললেন, এতদূর যখন এসেছেন, তখন এক পেয়ালা চা খেয়ে যান।

বাইরের ঘরে রূপশ্রীকে দেখে কনকেন্দু অপ্রতিভ হতে যাচ্ছিল, কিন্তু

ভদ্রলোক সে সুযোগ দিলেন না। বললেন, আসুন—আসুন, এ আমার বোন রূপশ্রী, ডাক নাম টুনটুনি।

রূপশ্রী আরো সহজ করে দিলে অবস্থাটা। একটু হেসে কপালে হাত তুলে নমস্কার করলে: ওঁকে আমি চিনি—উনি আমাদের সঙ্গে পড়েন। কিন্তু এ তোমার ভারী অন্যায় দাদা!

—কী, ডাক নাম ফাঁস করে দেওয়া?—ভদ্রলোক হেসে উঠলেন: যা, চা নিয়ে আয় আমাদের জন্যে। আর কিছু খাবার। উই আর ভেরি হাংগ্রি!

সেই শঙ্করদা—আর রূপশ্রী!

কনকেন্দু ঘুমভরা চোখ মেলল। ভালোই হয়েছিল—সেই দিনগুলিকে বহুকালের পেছনে ফেলে এসেছিল। আজ আর ফিরে আসার কোনো দরকার ছিলনা ওর। কেমন মনে হতে লাগল: সেই নদীর ধারে আর ঝাউবনের সুর এখানে বাজবে না—এখানে সব আলাদা। সেই আকাশ নেই—সে নৈঃশব্দ্য নেই; এখানে সবাই নিজেকে বড় বেশি মুখরতা দিয়ে প্রকাশ করে—এখানে নিজেকে ঘোষণা করতে হয় উগ্র ঔদ্ধত্য দিয়ে। সেই কিড লাভের রোমাঞ্চ এখানে তির্যক ব্যঙ্গের হাসির খোরাক—নিষ্ঠুর কৌতুকের উপাদান। হয়তো ক্যামেরাধারী ওই ছেলেটাই ঠিক বুঝেছে। ফুল এখানে আপনি কোথাও ফোটেনা—তাকে মার্কেট থেকে কিনে আনতে হয়!

—ঘুমুচ্ছেন মশাই?

প্রাণতোষবাবু। বাঁ দিকের একখানা ঘরে থাকেন। মার্চেন্ট অফিসে নিচের দিকে চাকরী করেন, লোকে কানাকানি করে, বেয়ারাগিরি করেন তিনি। কিন্তু প্রাণতোষবাবু বলেন, আমি জুনিয়ার ক্লার্ক। দেখুননা—ছ মাস পরেই ভালো একটা লিফ্‌ট পেয়ে যাচ্ছি।

চোখে মুখে অদ্ভুত একটা চাপা উৎকণ্ঠার ছবি। কী একটা দুশ্চিন্তায় যেন সারাক্ষণ পীড়িত হচ্ছেন। তাঁর মনের ভেতরে প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা আছে, তিনি কলকাতায় বাসা করবেন—স্ত্রীকে এনে কপোত-দম্পতীর একটি নিশ্চিত

সংসার পাতবেন এখানে। সিনেমা, থিয়েটার—জু গার্ডেন—ভদ্রভাবে বাঁচতে গেলে এখানেই থাকতে হবে।

—ভিলেজ বড় ন্যাস্টি মশাই—বেজায় ম্যালেরিয়া—একদিন ঘৃণাভরে জানিয়েছিলেন।

—তা বটে—কনকেন্দু মাথা নেড়েছিল : কিন্তু খাওয়া-দাওয়া—

—ওসব গাল-গল্প মশাই, শুনতেই ওরকম। সে নাকি ঠাকুর্দার আমলে ছিল, টাকায় এক মণ দুধ। এখন কলকাতার চাইতেও মাগ্‌গী—তাও জল মেশানো। মাছের মুখ দেখাই যায় না—তবে হ্যাঁ, মাছি-মশা কিঞ্চিৎ আছে বটে! আমিও তক্কে তক্কে আছি—বুঝলেন? একটা মওকা পেলেই ফ্যামিলি কলকাতায় নিয়ে আসব। বাবা ভিটে ছেড়ে নড়বেন না, থাকুন পড়ে। কিন্তু আমার ইয়ং ওয়াইফ রয়েছে—তারও তো একটা সাধ-আহ্লাদ আছে। কী বলেন—অ্যাঁ?

এ হেন প্রাণতোষবাবু এমন অসময়ে কী চান তার কাছে? বাসা ঠিক করে ফেলেছেন নাকি?

ধড়মড় করে কনকেন্দু উঠে বসল।

—আসুন।

যথানিয়মে প্রাণতোষবাবুও এসে সতরঞ্চিতে বসলেন। তারপর পকেট থেকে কী একটা টেনে বের করতে লাগলেন।

সর্বনাশ, এঁরও স্ত্রীর চিঠি নাকি? সকালে যোগদাবাবুর কথা মনে পড়ে কনকেন্দু শিউরে উঠল।

না—স্ত্রীর চিঠি নয়। হলদে মলাটের ছোট সাইজের একখানা বই—ওপরে ঘোড়ার ছবি আঁকা। সেইটে মেলে দিয়ে প্রাণতোষবাবু বললেন, দেখুন তো?

—এ যে রেসের বই মশাই! এর আমি কী জানি?

—কখনো যাননি?

—উঁহু, কোনোদিন না।

প্রাণতোষ বললেন, যাবেন দু একদিন, দেখবেন মজা! কত টিপ্‌স—কত স্পেকুলেশন। আর তা ছাড়া কত ঘোড়ার কত পেডিগ্রি—সে সব শোনবার

মতো। কোন্ ঘোড়ার ঠাকুর্দা ডার্বি জিতেছিল, কার মা এপ্‌সম্ প্লেটে দু লাখ পাউণ্ড এনে দিয়েছে—সে সব শুনতে খুব ইন্‌টারেস্টিং!

—মাপ করবেন, আমার কোনো কৌতূহল নেই।

—আপনি দেখছি শুধুই পড়ুয়া। যাক্—কী ধরব বলুন দেখি! গ্লোরিয়াস কুইন? রেড্ থাণ্ডার? গোল্ডেন মেইন?

—আমার কাছে সবই তো থাণ্ডারের মতো লাগছে। বলেছি তো, দূর থেকে রেস কোর্সের মাঠ দেখা ছাড়া ও সম্বন্ধে আর কিছুই আমার জানা নেই। দৌড়োবার জন্যেই ঘোড়ার চারটে পা—ঘোড়া দৌড়াবেই, তার জন্যে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ আমি খুঁজে পাইনা।

—তাইতো বলছিলাম। আপনিই হচ্ছেন খাঁটি লোক--যাকে আমার দরকার।

—মানে?—অকৃত্রিম বিস্মিত হল কনকেন্দু।

—মানেটা এখুনি বুঝবেন। চোখ বুজুন।

—চোখ বুজব? কিসের জন্যে?

—আহা, বুজুন না একবার।

অগত্যা বুজতে হল।

—এবার আঙুল রাখুন—হাঁ, আর একটু সরিয়ে। এই ঠিক হয়েছে। আচ্ছা, খুলুন চোখ। দেখি, কোথায় হাত রেখেছেন। আরে—আরে, এ যে ম্যাড্‌রাশ!

ককনকেন্দু বললে, ম্যাড্‌রাশ? কিসের?

—ঘোড়া, মশাই—ঘোড়া। আনাড়ীকে দিয়ে লটারী করালে মাঝে মাঝে নির্ঘাত লেগে যায়—বুঝলেন না? কিন্তু ম্যাড্‌রাশ! ভাবিয়ে তুললেন মশাই —ও ঘোড়া কি জিতবে? কেউ তো কখনো আশা করেনি। ওর তো কোনো বিশেষ পেডিগ্রি নেই। তা ছাড়া ওর যদিও—! তবু বলা যায় না— ম্যাড্‌রাশকেই ধরি।

—দাঁড়ান, দাঁড়ান!—আপনার আবার এ সব ঘোড়া রোগ কেন? মারা পড়বেন যে!

প্রাণতোষবাবু বললেন, ভাববেন না, দশ পাঁচ টাকার ওদিকে আমি নেই।

রিস্‌ক্‌ সামান্য, কিন্তু চান্স প্রচুর। একবার যদি লাগাতে পারি—বুঝলেন না? কলকাতায় ফ্যামেলি নিয়ে আসতে আর কতক্ষণ?

প্রাণতোষবাবু উঠলেন। বেরিয়ে যেতে বিড় বিড় করে আওড়াতে লাগলেন: কিন্তু ম্যাড্‌রাশ! তাই তো! ভারী ভাবনার কথা হল যে!

একবার 'পক্ষীর দ্বারা ভাগ্য পরীক্ষা' করানো লোকটির কাছে প্রাণতোষবাবুকে যেতে বলা উচিত ছিল, কনকেন্দু ভাবল। কিন্তু ঘোড়ার ভরসায় প্রাণতোষবাবু কলকাতায় বাসা করবার স্বপ্ন দেখছেন! ইয়াং ওয়াইফ্‌ মশাই, কত সাধ-আহ্লাদ! ওই রেসের মাঠে কি সেই আলাদীনের প্রদীপ আছে—যা তাঁর এই স্বপ্ন-কামনাকে কোনদিন সফল করে তুলতে পারে? কিন্তু ওখানে যারা গেছে—প্রদীপের বদলে দৈত্যটাই তার ঘাড় ভেঙেছে—এমনি জনশ্রুতিই তো শোনা যায় বরাবর।

সতর্ক দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে জ্ঞানাঞ্জনবাবুর ভাইপো ভূপেন ঢুকল। বয়েস উনিশ কুড়ি—কনকেন্দুর সমানই হবে। কিন্তু প্রথম দিন থেকেই দাদা ডেকেছে, কনকেন্দুও নাম ধরেই ডাকে।

—খবর কী ভূপেন?

ভূপেন পাশে বসে পড়ল। ফিস্‌ ফিস্‌ করে বললে, নতুন বই আছে—নেবেন?

—এখন তো হাতে পয়সা নেই।

—প্যাম্‌প্লেট্‌—দাম বেশি নয়। এই দেখুন না—আবার সতর্কভাবে চারদিকে তাকিয়ে ভূপেন বললে, চার আনা করে দাম, বইগুলো খুব ভালো কিন্তু।

জামার ভেতর থেকে তিনখানা চটি বই বের করলে সে। লাল মলাটের তিনখানা বই—ওপরে মার্ক্‌স, এঙ্গেলস্‌ আর লেনিনের ছবি। প্যারী কমিউন, ওয়েজ লেবার আণ্ড্‌ ক্যাপিটাল, হোয়াট ইজ লেনিনিজম্‌।

—দুটো চার আনা, আর এ ছ আনা: পয়সা কাল-পরশু যেদিন সুবিধে হয় দেবেন। কিন্তু বইগুলো দাদা আপনাকে রাখতেই হবে।

বইগুলো আধা বে-আইনি, কর্তৃপক্ষের খরদৃষ্টি আছে ওদের ওপরে।

বিছানার তলায় বই তিনটে গুঁজে নিয়ে কনকেন্দু হাসল : আচ্ছা, ক্রেডিটেই কিনলাম। কিন্তু তোমার খবর কী ভূপেন ? চাকরী-বাকরী হল ?

ভূপেন একটা হাই তুলল : ম্যাট্রিক পাশকে চাকরী আর কে দিচ্ছে বলুন ? ও সব হবে না।

— বসে বসে নিশ্চিন্তে কাকার অন্ন ধ্বংসাবে ?

—নিশ্চিন্তে আর ধ্বংসাতে পারছি কই ! ঘাড় ধরে বার করে দেওয়া ছাড়া কাকা আর সব কিছুই চেষ্টা করে দেখেছেন। টিঁকে যে আছি সেটা কাকার গুণে নয়—নিজের হাতযশে।

—তাই তুমি পরমানন্দে পলিটিক্‌স করছ ? সত্যি সত্যিই একদিন দেবেন তাড়িয়ে।

—উঁহু, পারবেননা—ভূপেন আর একটা হাই তুলল।

—এত নিশ্চিন্ত হচ্ছ কী করে ?—কনকেন্দু হাসল।

—মানে, কাকাকে ব্ল্যাক্ মেল করছি !—এবার ভূপেনও হাসল : আমিও শাসিয়ে রেখেছি। যেদিন আমাকে হোটেলে খাওয়ার পয়সা দেবেন না, সেদিনই খাঁ সাহেবকে বাত্‌লে দেব, কোথায় এবং কখন কাকার সন্ধান পাওয়া যাবে।

কনকেন্দু এবার সশব্দে হেসে উঠল।

—এটা কি রকম ? সোস্যালিজ্‌মে ব্ল্যাক্ মেলিংয়ের জায়গা আছে নাকি ?

ভূপেনও হাসল : মিউচুয়্যাল কো-অপারেশন। সোশিয়ালাইজড্ সমাজের গোড়ার কথা। কিন্তু এখন যাই—কাকার আসবার সময় হল। দেখি, কাছাকাছি কোথাও আগা সাহেব থাকলে আগে থেকেই লাইন-ক্লিয়ারের ব্যবস্থা করি।

তা বটে। ভূপেন যদিও জ্ঞানাঞ্জনবাবুর কাঁধে বোঝার মতো চেপে আছে এবং এই অবাঞ্ছিত বেকার ভাইপোটাকে কোনোমতে তাড়াতে পারলেই জ্ঞানাঞ্জনবাবু খুশি হন, কিন্তু তাঁরও অতিশয় দুর্বল জায়গা আছে একটা। হীরেনদার মতোই তিনিও কোনো এক সময়ে বাণিজ্য দিয়ে লক্ষ্মীলাভ করতে

চেয়েছিলেন। সেই উপলক্ষে খাঁ সাহেব—অর্থাৎ কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে কিঞ্চিৎ ঋণ তিনি নিয়েছিলেন। কিন্তু হীরেনদার আলুর ব্যবসার মতোই তাঁর ব্যবসাও পটল তুলেছে—হিসাবের খাতায় জমা পড়েছে এক ভীমদর্শন কাবুলিওয়ালা।

হিংয়ের গন্ধে সুরভিত একরাশ জাব্বাজোব্বা আর প্রকাণ্ড এক লাঠি হাতে করে যখন-তখন সে জ্ঞানাঞ্জনবাবুর দরজায় এসে হানা দেয়। হাঁক ছাড়ে—গেনাঞ্জন-অ; এ গেনাঞ্জন অ—

দর্শন দেয় ভূপেন: তিনি তো নেই।

কাবুলী হাল ছাড়েনা: কাঁহা গেয়া?

—আহিরিটোলা।

কাবুলি বেরিয়ে যায়। ভূপেন আবৃত্তি করতে থাকে: "ধন্য আশা কুহকিনি, তোমার মায়ায়—নাছোড় কাবুলি-দাদা ঘোরে নিরবধি—"

বাস্তবিক, জ্ঞানাঞ্জনবাবুর এক ধরণের জৈবিক শক্তি আছে বোধ হয়। কী করে যে টের পান তিনিই জানেন। ঠিক কাবুলী আসার আগেই তিনি হাওয়া হয়ে যান। ভোর চারটে থেকে রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত যখন-তখন আচমকা হাজির হয়েছে তবু জ্ঞানাঞ্জনবাবুকে ধরতে পারেনি। মেসের বাইরে সারা রাত লাঠি বাগিয়ে পাহারা দিয়েছে—না, তবুও না। কনকেন্দুর কখনো কখনো সন্দেহ হয়েছে—হয়তো বা ভেল্কি জানেন ভদ্রলোক। ইন্‌ভিজিব্‌ল ম্যানের মতো আবিষ্কার করেছেন কোনো আশ্চর্য ওষুধ!

আর মিথ্যে কথা বলবার জন্যে আছে ভূপেন। জ্ঞানাঞ্জনবাবু যেদিন টালায় যান, সেদিন সে কাবলীকে পাঠিয়ে দেয় আনোয়ার শা রোডে; যেদিন বেলেঘাটায় যান—সেদিন কাবলীকে রি-ডাইরেক্ট করে লিলুয়াতে। ভূপেন বলে, একবার ডেড্-লেটার অফিসে পাঠাতে পারলেই বাঁচা যেত।

মেসের সবাই একদিন ক্ষেপে উঠেছিল।

—যখন তখন কাবুলিওয়ালা এসে উৎপাত করে—ওকে আমরা আর আসতে দেবনা। এলে মেরে তাড়াব।

শুনে জ্ঞানাঞ্জনবাবুই জিভ কেটেছিলেন।

—ছি ছি, ওসব করবেন না। ওর ধর্মের টাকা, ও তো চাইতে আসবেই।

—কিন্তু তাই বলে দিন-রাত উপদ্রব করবে?

—আপনাদের কাউকে তো বিরক্ত করেনা। আমার সঙ্গে যা হয়, সে আমিই বুঝব। কিন্তু দোহাই আপনাদের—কোনো কথা বলতে যাবেননা ওকে।

ধর্মজ্ঞানটা সত্যি টনটনে জ্ঞানাঞ্জনাবাবুর। কারুর পাওনা টাকা তিনি মারবেননা। আপাতত দিতে পারছেননা বলে এক-আধটু গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হচ্ছে এই আর কি! কিন্তু কেউ বলতে পারবে—জ্ঞানাঞ্জনবাবু হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে ওঠেন: এই জ্ঞানাঞ্জন সেন কারুর একটি পয়সাও মেরেছে? ধার করতে পারি, কিন্তু চোর নই!

চিন্তাটা কেটে গেল। গোকুল, নকুল এবং সুদাম ফিরলেন।

—কই কনকবাবু, খাইতে গেলেননা এখনো?—গোকুলবাবু ডাকলেন।

—হাঁ যাই,—কনকেন্দু উঠল। র‍্যাপারটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে চটি টেনে বেরিয়ে গেল বাইরে।

প্রায় দশটা বাজে—পথের ওপর শীতের কুয়াশা। গাঙ্গুলীর দোকানে নিশাচরদের আসর জমে উঠেছে। বাইরের যে বিবর্ণ বেঞ্চিদুটো দিনের বেলায় রোদ-বৃষ্টির করুণায় নির্ভর করে থাকে এবং বকুর লাঠির ঘা পিঠে না পড়া পর্যন্ত যার ওপরে এক ফাঁকে একটুখানি ঝিমিয়ে নেয় রাস্তার ঘেয়ো কুকুর—তার ওপরে ঠাসাঠাসি মানুষের ভিড় এখন। সেই বাবরী চুল আর আদ্দির পাঞ্জাবী—নেশায় উজ্জ্বল রক্তিম চোখ। প্লেটের গরম ঘুগনি থেকে ধোঁয়া উড়ছে—নেশায় চোখ-লাল মানুষগুলি তাই চামচে দিয়ে খাচ্ছে তরিবৎ করে।

—ওরকম দেখেছি অনেক শালাকে—দেব একদিন পেট ফাঁসিয়ে।—কে যেন বললে। ফুটপাথ দিয়ে একটি মেয়ে চলেছে অনাসক্ত ভাবে—যেন বেড়াতে বেরিয়েছে শীতের এই রাত দশটায়। যারা ঘুগনি খাচ্ছিল, তাদের একজন কনুইয়ের ছোট একটি ধাক্কা দিলে তাকে।

—আ মর্!—মেয়েটি ঘুরে দাঁড়ালো। তারপর রংকরা ভ্রূর নিচে জ্যোতিঃহীন চোখে একটা তীব্র দৃষ্টি হানবার চেষ্টা করে বললে, কোথাকার মরা গোরু রে! ভাগাড়ে ফেলবার লোকও কি জোটে না?

—তুমিই ঠ্যাং ধরে টেনে নিয়ে যাওনা দিদি—কে আর একজন রসান দিলে।

একটা অশ্লীল হাসির ঢেউ উঠল। দ্রুত জায়গাটা পেরিয়ে গেল কনকেন্দু।

পাইস হোটেল বেশি দূর নয়—পর পরই আছে গোটা কয়েক। প্রায় পাইস্-হোটেল পাড়াই বলা যায় এটাকে। তারই একটায় সে ঢুকল। খাপরার ঘর—টিনের চাল—বাঁধানো মেজেতে এখানে-ওখানে গর্ত হয়ে গেছে। জলে জলে মেজেটা স্যাঁতসেঁতে। 'দি এরিয়ান পাইস্ হোটেল—'। কাঁচা হাতে লেখা সাইন বোর্ডে আরো বিস্তৃত পরিচয়: "হিন্দুগণের সুলভে উৎকৃষ্ট আহার।"

ছেঁড়া মাদুরের আসনে বসে সুলভেই উৎকৃষ্ট আহারটা সম্পন্ন করলে হিন্দু কনকেন্দু। একটা বিশেষত্ব এই পাইস্ হোটেলগুলোর সে লক্ষ্য করেছে। রান্নার এমন একটা বিচিত্র স্বাদ এরা কী করে তৈরী করে কে জানে! হয়তো কোনো বিশেষ পাইস্ হোটেল মশলা আছে এদের! সেই আন্তর্জাতিক স্বাদ—এক এবং অদ্বিতীয়। তবে চৈনিক আরশোলা আর হনোলুলুর টিকটিকি না পেলেই বাঁচা যায়।

আর অদ্বিতীয় ঠাকুরের সেই একটানা হাঁকাহাঁকি! যেন থিয়েটারের মুখস্থ পার্ট আউড়ে যাচ্ছে অনর্গল।

: লিখবেন তেরো নম্বরে ডাল—ছ্যাচ্ড়া-মাছের লটপটী—লিখবেন ছ'নম্বরে মুগের কারী আর ডিমের লবঙ্গ লতিকা, লিখবেন আট নম্বরে মাছের ঝাল আর চিংড়ির মনমোহিনী—লিখবেন—

কিন্তু কী করেই বা এত তাড়াতাড়ি লেখে লোকটা? পাইস্ হোটেলের মালিকেরা কি শর্ট হ্যাণ্ড্ জানে?

লোক বেশি নেই—খাবারও ঠাণ্ডা। মাছের বদলে কাঁটাই পাওয়া গেল

একখানা। তবু আট পয়সায় ভূরিভোজ হল মন্দ নয়। ভূতো মাফলার জড়ানো থক্থকে কাশিওয়ালা প্রোপ্রাইটারের হাতে পয়সা গুঁজে দিয়ে মৌরি চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে পড়ল সে।

কেমন খেয়াল হল, এখনি মেসে না ফিরে একটু বেড়ানো যাক।

না, বড় রাস্তার দিকে নয়। ওদিকে স্বাভাবিক জীবনের স্রোত এখন রুদ্ধ হয়ে এসেছে—বন্ধ হয়ে গেছে দোকানের ঝাঁপ—শুধু খোলা আছে পান বিড়ির দোকান, তাদের কোনো কোনটায় মদ বিক্রী হয় বিনা লাইসেন্সে, কোথাও কোথাও কোকেন। তা ছাড়া দরজায় দরজায় নিশীথ নায়িকার 'শবরীর প্রতীক্ষা'—লম্পটের আনাগোনা, দুটি-চারটি ত্রস্তগতি নিরীহ পথিক আর পাহারাওয়ালার শিকার-সন্ধান।

ও পথে সুবিধে হবে না তার। গঙ্গার দিকেই যাওয়া যাক।

ধূমপানের অভ্যাস তার নেই, বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়ে এক আধটা সিগারেটে টান দিয়েই ছেড়ে দিয়েছে। শীতটা বেশ কড়া আজ—কড়াজাতের একটা কিছু খেতে ইচ্ছে করল। দু পয়সা দিয়ে চুরুট কিনে সেইটে ধরিয়ে মন্থর গতিতে চলল, চলল রথতলা ঘাটের সন্ধানে।

দু পাশে বড় বড় পুরোনো বাড়ি—অনেকগুলোই ফাঁকা। কোনো কোনোটার জীর্ণ দেওয়ালে অশথের চারা মাথা নাড়ছে গঙ্গার তুহিন হাওয়ায়। ডান দিকের যে ফাঁকা রাস্তাটা কাশী মিত্রের শ্মশানে চলে গেছে, সেখানে সমাধিভূমির মতো কতগুলো শূন্য পাটগুদাম—এক কালে পাটের বাজারে যখন মুঠো মুঠো সোনার মতো টাকা ঝরে পড়ত, তখনকার স্মারক ওরা। সেদিন আর নেই, এখন পড়ে আছে লক্ষ্মীশ্রীহীন রিক্ততা নিয়ে। কনকেন্দু শুনেছে, অনেক অপরাধ, অনেক গুমখুনের ওরা লীলাক্ষেত্র আজকাল।

কেমন গা ছম্‌ছম্‌ করতে লাগল। কিছুদিন আগেই নাকি ওই পথটার ওপর পাওয়া গিয়েছিল একটা রক্তাক্ত কবন্ধ।

ছোট্ট গুমটি—স্ট্র্যাণ্ডের অপরিচ্ছন্ন রেল লাইন। দূরে কাছে কতগুলো কাটা মালগাড়ি দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে। একটা কুকুর কুঁই-কুঁই করে ডেকে উঠল কনকেন্দুকে দেখে। ওকে ভয় দেখাতে চায় না—নিজেই ভয় পেয়েছে,

তার প্রমাণ। ওরা তো রাত্রিচর—অমাবস্যার মাঝরাতে কাশী মিত্রের ঘাটে কাদের সঙ্গে যে ওদের দেখা হয় সে খবর ওরাই বলতে পারে।

ঘাটটা কালো-ধূসর অন্ধকারে মিথর। গঙ্গার তমসা প্রবাহে কুয়াশার মেঘাবরণ। শীতের মরা স্রোতে নদীর কলধ্বনি প্রায় শোনাই যায় না—একটা চাপা কান্নার মতো মনে হয় শুধু। ঘাটের ছাউনির তলায় কম্বল মুড়ি দিয়ে কয়েকটি মানুষ ঘুমে অচেতন—দূর থেকে নিঃশ্বাস পড়া দেখা যায়না, যেন একগাদা মড়া ছড়িয়ে আছে। বিহারের গ্রামাঞ্চলে একবার সে কতগুলো কম্বল জড়ানো প্লেগের মড়া দেখেছিল, ছেলেবেলার সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতিটা হঠাৎ মস্তিষ্কের মধ্যে চিন্ চিন্ করে উঠল।

ধ্যেৎ, বাজে সমস্ত ভূতুড়ে ভাবনা। হৃৎপিণ্ডের আর ঠোঁটের মাংসপেশীর সমস্ত শক্তি এক সঙ্গে জড়ো করে কনকেন্দু চুরুটে একটা টান দিলে—যেন নির্ভয় হতে চাইল। তারপর সরে এসে বসল পোস্তার ওপর—গঙ্গার দিকে পা ঝুলিয়ে।

বাঁ দিকে কয়েকটা খড়ের নৌকা জড়াজড়ি করে আছে—সেখানে আড়ষ্ট গলায় কে একটা কী বলে উঠেই চুপ করে গেল। ঘুমের মধ্যে কথা কইল খুব সম্ভব। কিন্তু মৃত্যু কী আজ রাত্রে কনকেন্দুর সঙ্গ ছাড়বেনা? চোখ চলে গেল দূরে কাশী মিত্র ঘাটের দিকে—পাঁচিলের ওপারে চিতার আগুনের রক্তিমা অনেকখানি পর্যন্ত ছুঁয়ে আছে—মানুষ-পোড়া তামাটে-ধোঁয়া ওপরের স্তব্ধ কুয়াশার মেঘস্তরে যাচ্ছে মিলিয়ে। কী একটা স্ট্যাটিস্টিক্স্ যেন বেরিয়েছিল কাগজে? হিউম্যান বডির প্রোপার্টির মোট দাম কত? দু শিলিং কত পেন্স?

না, ওসব শ্মশান-বৈরাগ্য নয়। কাশী মিত্র থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে গঙ্গার দিকে তাকালো সে। ওপারে আলোগুলো কুয়াশার মধ্যে ভাসছে—হারিয়ে যাচ্ছে—স্বচ্ছ জলের মধ্যে এক এক ঝাঁক মাছের মতো ঝলকে উঠছে থেকে থেকে। আর চারদিকে ভিজে ধুলো আর গঙ্গার কাদার গন্ধভরা রাত্রি—সদ্যোবিধবার মতো কলকাতা যেন শোকে মূর্ছিত হয়ে আছে এইখানে। কাশী মিত্রের ঘাটে এক মাথা এলো চুল ছড়িয়ে যে মেয়েটি

মৃত স্বামীর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছিল—তার স্মৃতিটা ভেসে উঠছে।

রবীন্দ্রনাথের লাইন মনে পড়তে লাগল :

'মোরে করো সভাকবি ধ্যান-মৌন তোমার সভায়
হে শর্বরী, হে অবগুণ্ঠিতা—
যুগ-যুগান্তর ধরি মহাকাশে জপিছে যাহারা
বিরচিব তাহাদের গীতা—'

হঠাৎ ধ্যান ভেঙে গেল।

পাশ দিয়ে গেল রিকশা একটা। তার মধ্যে থেকে অন্ধকারে প্রক্ষিপ্ত হল একটা স্বর। শোনা গেল নারী কণ্ঠের আর্তি : এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলে ন'কাকা? ওরা সব খারাপ মেয়ে—কী করে থাকব ওদের মধ্যে?

—ভাবিস্নি—ভাবিস্নি, সব সয়ে যাবে—নিস্তব্ধ রাত্রিতে খানিকটা এগিয়ে যাওয়া রিক্সা থেকেও ন'কাকার নিষ্ঠুর একটা হাসি যেন পরিষ্কার শুনতে পেল কনকেন্দু।

সন্দেহে মন হঠাৎ কুটিল হয়ে উঠল। একটা কিছু পাপ আছে ওখানে—একটা সর্বনাশ, একটা আতঙ্ক, একটা অপরাধ। ওই ন'কাকা একটি হতভাগিনী মেয়েকে কোন্ সর্বনাশের ভেতরে টেনে নিয়ে চলেছে কে জানে। কে বলতে পারে, কোন পাড়াগাঁয়ের শুচিস্মিতা কন্যাকুমারীকে কলকাতা দেখাবার নামে নরকের মধ্যে টেনে নামাচ্ছে কিনা রাত্রির প্রেতিনীদের দলে? ওরা সব খারাপ মেয়ে—কী ইঙ্গিত ছিল কথাটার মধ্যে? কী অর্থ ছিল টানা টানা ওই নিষ্ঠুর হাসির?

একটা প্রচণ্ড আবেগ এসে আচমকা কনকেন্দুর গলা চেপে ধরল—যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইল। এখনো হয়তো ছুটে গিয়ে রিক্শাটা চেপে ধরলে মেয়েটাকে বাঁচানো যায় রাক্ষসের গ্রাস থেকে। রোধ করতে পারে একটা অপমৃত্যু—একটি অভাগা মেয়ের মর্মান্তিক পরিণাম! উঠে দাঁড়াবার জন্যে একবার নড়েও উঠল সে। কিন্তু—

কিন্তু, কে জানে। ছাড়া ছাড়া টুকরো কয়েকটা কথায় কি কোনো অর্থ

আছে? আর কী শুনতে কী শুনেছে তারই বা ঠিক আছে না কি। হয়তো শেষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটাই একটা চমৎকার প্রহসন হয়ে দাঁড়াবে— যার ভালো সে করতে চেয়েছে, তারই হাসি হয়তো ভয়াবহ হয়ে বিঁধবে তাকে। না, এভাবে বোকা হয়ে যেতে সে রাজী নয়।

আর তা ছাড়া বিছিন্ন হয়ে কার কতটুকু ভালো সে করতে পারে? শুধু নিথর রাত্রির এই গঙ্গার ধারেই নয়—আজ এই মুহূর্তেই কলকাতার নিচের তলায় ঘটে চলেছে কত বীভৎসতম পাপ—কত ভয়াবহ অপরাধ, কত সমাজ-ব্যধির বীজাণু বুদ্‌বুদিয়ে উঠছে কুৎসিত অন্ধকারে—কে তার হিসাব রাখে? তার দায়িত্ব যদি সমাজ না নেয়—একা ব্যক্তিত্ব কতটুকু করতে পারবে সে?

কিন্তু লেনিন কী বলেছিলেন? সমাজের ব্যক্তির ভূমিকা কী?

কী আশ্চর্য—মাঝ রাতে গঙ্গার ধারে এসে সে কি বসেছে তত্ত্বচিন্তা করবার জন্যে? এই জন্যেই কি সে খুঁজে নিয়েছে শীত-জর্জর প্রহরের নিঃসঙ্গ অবসরটিকে? না, আরো কিছু ভাবা যাক। কিছু উত্তেজক—কিছু রোমাঞ্চকর —যা বাইরের এই হিমাক্ত অনুভূতিকে খানিকটা উত্তপ্ত করে তুলবে।

রূপশ্রী।

রবিবারে যেতে বলেছে। মুহূর্তের জন্যে স্নায়ুগুলো একটুখানি সজাগ হয়ে উঠেই আবার আড়ষ্ট হয়ে গেল। পূর্ববঙ্গের শহরের দিনগুলি কি তেমন করে কথা কইবে এখানে? সেই নদী নেই, সেই ঝাউবন নেই—ওপারের নারিকেল-বীথির মাথার ওপর তেমন করে খণ্ড চাঁদ দেখা দেবেনা কলকাতায়। হঠাৎ মনে হবেনা—দুজনের মাঝখানকার নীরবতাটুকু সুরে ভরে উঠেছে—। কথা এখানে নিরর্থক, কিছু না বলেই যা সবচেয়ে ভালো করে বলা যায়—কথা তাকে আঘাত করবে ক্রমাগত!

তাছাড়া সেখানে তবু মিশবার একটা অধিকার ছিল। অন্তত কনকেন্দু মনে করতে পারত, সে ভুঁইফোঁড় নয়—তারও দাঁড়াবার মতো ডাঙা আছে কোথাও। কিন্তু এখানে? কোনোদিন যদি রূপশ্রী বলে বসে, চলুন, আপনার মেস্‌ থেকে একটু বেড়িয়ে আসি—তা হলে?

এই আটাত্তরের একের এ বাড়ি। এই পাশাপাশি মাদুর সতরঞ্চির

বিছানার গোকুল-সুদাম-যতীন পুতিতুণ্ডির সঙ্গে দিন যাপন। সহ্য করতে পারবে রূপশ্রী—বিশ্বাস করতে পারবে? শঙ্করদার সঙ্গে তার আলোচনার মধ্যে, কলেজের ডিবেট আর সাহিত্য চর্চায়, ভালো ছেলে হিসেবে খ্যাতির মধ্য দিয়ে যে আসনটুকু সে গড়তে পেরেছে রূপশ্রীর মনে—সঙ্গে সঙ্গে যে তা ধুলোয় যাবে মিলিয়ে।

নাঃ, অসম্ভব। সে দুর্ঘটনা ঘটার আগেই রূপশ্রীকে দূরে সরিয়ে দেওয়া উচিত। অধ্যাপক শঙ্কর মুখার্জির ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে থাকা যায়, সেইটেই নিরাপদ।

"যাওয়ার সময় হলে যেয়ো সহজেই
আবার আসিতে হয় এসো—"

আসবার সময় আর কখনো হবেনা। তার চাইতে আগে থেকে সরে যাওয়াই ভালো।

কিন্তু কাঁদছে কে? এমন ভাবে কে ফুঁপিয়ে উঠল অন্ধকার পোস্তার তলায়?

ভয়ানক একটা চমক খেলো সে। রাত এগারোটা, নির্জন ঘাট, দূরে শ্মশান। কনকেন্দুকে এখানে এ-সময়ে একা বসে থাকতে দেখে প্রেতলোক থেকে কেউ কি এসে পড়ল আলাপ করবার জন্যে? কিছুই অসম্ভব নয়। ভূত সম্পর্কে কনকেন্দু প্রায় অ্যাগ্‌নস্টিক।

সভয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ভয়টা বেশিক্ষণ রইল না—চমকটা প্রবল হয়ে উঠল তার চেয়েও বেশি। ওদিকে পোর্ট কমিশনারের ছোট অফিসটার পাশে একটা ইলেকট্রিকের আলো, কনকেন্দু তাকিয়ে দেখল, তারই একটুখানি কী করে নিচের মানুষটির চোখে-মুখে এসে পড়েছে। একটি মেয়ে—এবং সে বিধবা।

আত্মহত্যা করে বসবে নাকি গঙ্গায়? কী সর্বনাশ! রকম-সকম দেখে তেমনি একটা সন্দেহ হচ্ছে যে! কনকেন্দু এবার আর কর্তব্যে অবহেলা করতে পারল না, ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কে, কে ওখানে?

নিচের মানুষটিও তারই মতো চকিত হয়ে উঠল—সেও দাঁড়িয়ে পড়ল। আর ইলেকট্রিকের আলোটা এবারে তার সর্বাঙ্গ উদ্ভাসিত করে দিলে।

সীমাহীন বিস্ময়ে কনকেন্দু দেখল : মেয়েটি তার চেনা। সেই শ্যামাদাসের হোটেলের কুখ্যাত রাঁধুনিটি—যাকে নিয়ে সকাল বেলাতেই সুন্দ-উপসুন্দের যুদ্ধ হয়ে গেছে এবং ঘণ্টা তিনেক আগেও হাসিভরা গোলগাল মুখে যে ভাত সাজাচ্ছিল পেতলের থালায় থালায়! সেই চম্পাবতী!

— এত রাত্রে আপনি কী করছেন এখানে ?

চম্পাবতী কনকেন্দুকে চিনতে পারল। আশ্চর্য, এত কান্না কী করে সামলে নিল সে—হেসে উঠল এমন লঘুভঙ্গিতে ?

—কিন্তু কাঁদছেন কেন আপনি ?

—না, কাঁদিনি তো। —অভিনেত্রীর দক্ষতায় চম্পাবতী বললে, রান্নাবান্নার পাট চুকিয়ে রোজ রাতেই আমি একবার গঙ্গাজল মাথায় ছোঁয়াতে আসি। বিধবা মানুষ—এঁটো-কাঁটা ঘাঁটতে হয় কিনা সাত জাতের!

মিথ্যেটা এমন নির্লজ্জ যে কনকেন্দু জবাব খুঁজে পেল না। আহা, কী নিষ্ঠাবতী আদর্শ বিধবা এই মেয়েটা!

চম্পাবতী দ্রুত এগিয়ে গেল গঙ্গার দিকে। এক আঁজলা জল তুলে নিয়ে ছিটিয়ে দিলে মাথায়।

তারপর পোস্তার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে যেন স্বগতোক্তি করলে, যাই শুই গে, অনেক রাত হয়ে গেছে।

শুভ্র কুয়াশায় চম্পাবতীর শাদা শাড়ীটা মিলিয়ে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরে পর্যন্তও কনকেন্দু দাঁড়িয়ে রইল সেইখানেই। তারপরে হঠাৎ তার খেয়াল হল, রাত অত্যন্ত বেশি হয়ে গেছে। এর পরে নিচের তলার উড়িয়ারা সদরে তালা দিয়ে দেবে এবং দু ঘণ্টা ডাকাডাকি না করলে সে দরজা আর খোলানো যাবে না। তা ছাড়া রাত বেশি হয়ে গেলে ওই কাশী মিত্র ঘাটের দু একজন এদিকে যে বেড়াতে আসতে পারে না, তাই বা কী করে বলা যায় ?

মন্থর পায়ে সে মেসের দিকে ফিরতে লাগল। বাইরের কুয়াশার মতোই একটা জিজ্ঞাসার কুয়াশা তার মাথায় পাক খাচ্ছে : সত্যিই এত রাতে গঙ্গার ধারে কী চায় চম্পাবতী ?

ছয়

—খট্-খট্—খর্-র্-র্—

পাশের ঘরের দর্জির কলটা আবার চলতে আরম্ভ করেছে। আবার সেই বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে পচা মাড়ের গন্ধ। যেন এই জীর্ণ বাড়িটার বিষ-নিশ্বাস!

—নাঃ, টিঁকতে দেবে না মনে হচ্ছে। আজ শনিবার—ক্লাশ নেই ইউনিভার্সিটিতে—নির্জনে কনকেন্দু বসেছিল ভূপেনের সেই প্যাম্‌ফ্লেটগুলো নিয়ে। ওয়েজ লেবার এ্যাণ্ড ক্যাপিটালের মধ্যে মনটা যখন বেশ নিবিষ্ট হয়ে গেছে তখন শুরু হল দর্জির কলের ভূমিকম্প।

অবশ্য ব্যাপারটা লেবারেরই—কিন্তু এমন কথা সমাজ-বিজ্ঞানীরা নিশ্চয় কোথাও বলেননি যে কানের কাছে ঘটর ঘটর করে কল চলাটাই আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার লক্ষণ। উঁহু, ওটা যতক্ষণ চলবে, ততক্ষণ পড়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। এর চেয়ে বেরিয়ে পড়লেই ছিল ভালো; আর কোথাও না হোক অন্তত মিউজিয়ামে গিয়েও পাল যুগের ভাস্কর্য আর গান্ধার আর্ট পর্যবেক্ষণ করা যেতো কিছুক্ষণ। নেহাৎ পক্ষে পার্ক সার্কাসের সেমেটারিতে গিয়েও বসা যেত চুপ করে। ওটা তার ভারী প্রিয় জায়গা।

কিন্তু কলের ওপরেও কল আছে—পরক্ষণেই প্রমাণ হল সেটা। হঠাৎ সিঙ্গল-রীড হারমোনিয়ামের তীব্র প্যাঁ প্যাঁ আর জয়ঢাকের মতো ঘোরতর তবলার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে দশ বারোটি ছেলের গলায় বিকট সমবেত সঙ্গীত শোনা গেল:

"আজি আলো ঝল্‌মল্ আলো ঝল্‌মল্—পূর্ণিমার রাত্তি গো—
মধু হেঁসে বোসো এসে দিল্-মজানো সাথী গো।"

এই সেরেছে! বেলা আড়াইটার সময় এতগুলো ছোকরা আলো ঝলমল পূর্ণিমার রাত দেখল কোথায়! আর যে ভাবে এক সঙ্গে শেয়ালের মতো তান ধরেছে, তাতে মধু 'হেঁসে' পাশে এসে বসবে, এমন বেকুব সাথীও কি সৃষ্টি হয়েছে নাকি দুনিয়ায়?

"প্রাণ পিয়ালা ভরা মধু—
পিয়ো—পিয়ো রসিক বঁধু—"

একেবারে জমাট ব্যাপার যে! মদন শীলের একটা আড্ডা-কাড্ডা আছে নাকি ওখানে? বাইজী না থাক, বিকল্পে জুটিয়ে নিয়েছেন একদল ছোকরাকেই?

ঝম ঝম করে নূপুরের আওয়াজ উঠল। শুধু গান নয়—নাচও চলছে। কিন্তু অতগুলো ছেলের সরু মোটা গলায় যে আবাহন উঠছে, তাতে বিন্দুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান থাকলে কোনো রসিক বঁধুর এ তল্লাট মড়ানো উচিত নয়।

মনে পড়েছে। ঠিক বটে—বাড়িটার পেছন দিকেই 'কিন্নর অপেরা পার্টি'র আড্ডা। এদিকে একটা কানা গলির মুখে সে সাইনবোর্ড ঝুলতে দেখেছে বটে। তা হলে ওই গানটা সেই কিন্নরদেরই কিন্নর কণ্ঠের অবদান।

গাঙ্গুলীর দোকানে একদল ছেলে পাতায় করে ঘুগনি চাটে—বিড়ি খায়, নোংরা ইয়ার্কি করে। তখন মনে হত, এসব ছেলের কি মা-বাপ নেই? ছেলেগুলো রাস্তায় রাস্তায় এমনি বখে যাচ্ছে, তবু তারা থাকে কানে তুলো দিয়ে, চোখে ঠুলি এঁটে! এখন বোঝা গেল—ওরাই সেই দেবকণ্ঠ কিন্নর শিশুরা। যাত্রার দলের সখী সাজে, যারা একটু দেখতে ভালো—তারা রাজকুমারী, শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণ আর প্রহ্লাদের পার্ট পর্যন্ত করে। যাত্রার দলের ছেলে ওরা—সত্যি সত্যিই মা-বাপের বালাই নেই। একেবারে আকাশ থেকে ঠিকরে পড়েছে—সাক্ষাৎ দেবাংশ-সম্ভূত!

সেলাইয়ের কলের সঙ্গে যাত্রার দল যখন মিলেছে, তখন আর পড়ার চেষ্টাটা পণ্ডশ্রম। বরং এই ফাঁকে যতীন পুতিতুণ্ডির অত্যাশ্চর্য তিল তেল আর বাতের মলমের একটা যুগান্তকারী বিজ্ঞাপন লেখা যাক। কাগজ টেনে নিয়ে কনকেন্দু অগত্যা তাতেই মন দিলে।

"পরীক্ষা করুন! পরীক্ষা করুন!! পরীক্ষা করুন!!!

যোগবলের সাহায্যে যে কী আলৌকিক ব্যাপার হইতে পারে, তাহা অবিশ্বাসীদিগের ধারণাতীত। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রদত্ত এই অমোঘ—"

আচ্ছা, যাজ্ঞবল্ক্য কেন? যতদূর মনে পড়ছে, বোধ হয় কবিরাজী বিদ্যেটা চ্যবনেরই কিঞ্চিৎ রপ্ত ছিল—তাঁর নামে চ্যবনপ্রাশটা চালু রয়েছে বাজারে।

কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যকেও তুচ্ছ করা উচিত নয়! তাঁর কাছেই না কে যেন অমৃত চেয়েছিলেন: 'যেনাহং নামৃতাস্যাম্—'

"অমৃতই যিনি দিতে পারেন, একটা বাতের মলম এমন আর কী অসম্ভব তাঁর পক্ষে? অতএব তাঁকেই কাজে লাগানো যাক—"এই অমোঘ ঔষধ ব্যবহার করিলে হেঁড়ে বাত, গেঁটে বাত,—"

কিন্তু আর কী কী বাত আছে? সব বাতের কথা তার তো জানা নেই। আচ্ছা, আপাতত জায়গাটা খালি থাক, যতীন পুতিতুণ্ডি এলে—

—চিঠিটা একবার লিখে দিন তো! চশমার দোকানটা আজ বন্ধ, কালকের আগে পাব না। দিন এই কটা কথা লিখে—

যোগদাবাবু এসেছেন। অঙ্গগন্ধেই টের পাওয়া যাচ্ছে সেটা। ভদ্রলোকের নাম যোজন-গন্ধ দিলে কেমন হয়?

স্ত্রীর নীল কাগজের জবাবে এনেছেন একখানা বালি কাগজ। ইচ্ছে করেই এনেছেন কিনা কে জানে!

বসে পড়ে বললেন, কালকের চিঠিটার জবাব—

কনকেন্দু ইতস্তত করতে লাগল।

—ভয় নেই মশাই, বেশিক্ষণ, কাজের ক্ষতি করবনা আপনার। পাঁচ মিনিটেই হয়ে যাবে।

—সে জন্যে বলছিলাম না। মানে—

—মানে কিছু শক্ত নয়। একটু উপকার করে দেবেন—সেই জন্যেই আসা।

—কিন্তু এসব পার্সোনাল ব্যাপার—

—সব চিঠিই পার্সোনাল মশাই—চিঠি তো হ্যাণ্ড বিল নয় যে "এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানাইতে হইবে।" ও পাওনাদারের কাছে লেখাও যা, বৌয়ের কাছে লেখাও তাই।

—তবু দেখুন—

—এর ভেতরে আবার 'তবু'টা এল কোথেকে? ওসব দেখা-দেখির ভেতরে আমি নেই—জানলেন? আরে আমি কি আমার বৌয়ের গিন্নির মতো

ফর্দি করতে বলেছি চিঠিতে। দোকানদারী করি—সোজা হিসেব বুঝি। আমার কথা একদম চাঁছাছোলো। নিন্—লিখে যান—

যোগদাবাবু অনুরোধ করেন না, দস্তুরমতো ধমক দেন। তাঁর বিরক্তিকর উপস্থিতির হাত থেকে আত্মরক্ষা করার শ্রেষ্ঠ উপায় হল কাজটা করে দেওয়া। অগত্যা পুতিতুণ্ডির হ্যাণ্ডবিল রেখে যোগদাবাবুর চিঠি নিয়েই বসতে হল তাকে।

অত্যন্ত ব্যাজার মুখে ব্যাণ্ডেজের ওপরটা চুল্‌কোতে চুল্‌কোতে আধবোজা চোখে যোগদাবাবু বলতে লাগলেন : পরম কল্যাণীয়াসু, প্রিয়ে হাস্নুহানা—

—হাস্নুহানা!—কনকেন্দু চকিত বোধ করল।

—হাঁ—হাঁ—হাস্নুহানা!—যোগদাবাবু বোধ হয় দাঁত খিঁচালেন : দেখতে গুব্‌রে পোকার মতো কিন্তু নামের কায়দা শুনলে চোখ কপালে চড়ে যায়। মডার্ণ হয়েছেন—বুঝলেন না? আমি নাম দিয়েছিলুম মঙ্গলাসুন্দরী, শুনেই ফ্যাঁচ্‌ করে উঠলেন। মরুক গে, লিখেই যান—

তোমার পত্র পাইয়া খুবই বিরক্ত হইলাম। বাপের বাড়ি যাইতে চাহিয়াছ, কিন্তু বিনয়ের সঙ্গে কেন? ওই হারামজাদা বিনয়কে দেখিলে আমার পিত্ত পর্যন্ত—

—চিঠিতে এটা ঠিক হচ্ছে কি? এই ধরণের গালাগালি—

—হাতের কাছে আর পাচ্ছি কোথায় যে চুলের মুঠি টেনে ধরব? আপনি লিখুন না মশাই—

নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচী। কনকেন্দুও নির্বিকার ভাবে লিখে চলল। চিঠিটা যা দাঁড়ালো তা আর কহতব্য নয়। আশ্চর্য মনে হল যোগদাবাবুকে। এতদিন বিশ্বাস ছিল তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী স্বামীর মাথায় চড়ে বসে থাকে, এখন দেখা গেল নিয়ম মাত্রেরই ব্যতিক্রম ঘটে। বোঝা গেল তৃতীয়ার পদসেবা তিনি অন্তত করেন না, দরকার হলে বরং করিয়ে নেন তাকে দিয়ে। অধিকন্তু দু' একটা পদাঘাতেও তাঁর বিশেষ অরুচি আছে মনে হল না।

চিঠি শেষ করিয়ে যোগদাবাবু উঠলেন। বিদায়-সম্ভাষণ যা রইল তা এই : "আমাকে বেশি ঘাঁটাইয়ো না। মনে রাখিয়ো রাগিলে আমার জ্ঞান থাকে

না। বাড়ি গিয়া যদি একটা কাণ্ড করিয়া ফেলি, তাহা হইলে তখন আমাকে দোষ দিয়ো না। ইতি তোমার স্বামী—" 'স্বামী শব্দটার ওপর বেশি জোর দিয়েছিলেন যোগদাবাবু—"শ্রীযোগদাচরণ সরকার।" একেবারে মধুরেণ সমাপয়েৎ!

কোথায় যোগদাবাবু আর কোথায় হাস্নুহানা! বড় বেমানান—বড় বেশি গুরুচণ্ডালী! বিনয়দার যদি একবিন্দুও সৎসাহস থাকে—

ছিঃ—ছিঃ—আবার সেই বে-আইনি ভাবনা! কনকেন্দুর হল কী! একেবারে অধঃপাতে নেমে যাচ্ছে যে! নাঃ—ওসব থাক। পুতিতুণ্ডির হ্যাণ্ড্‌বিলটাই শেষ করা যাক বরং।—"ইত্যাদি সর্বপ্রকার বাত চিরতরে নির্মূল হয়। এই বাতের মলম মালিশ করিয়া বোম্বাগড়ের মহামান্য রাজাবাহাদুর, হিজ হাইনেস্ নবাব অফ্ আক্কেলনগর—"

বোম্বাগড় আছে সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোলে'। কিন্তু সত্যি সত্যিই আক্কেলনগর বলে কোনো নেটিভ্ স্টেট্ কোথাও নেই তো? তা হলেই সর্বনাশ করে বসবে যে! একটা লাখ টাকার দাবিতে মানহানির মামলা ঠুকে দিলেই কেলেঙ্কারী। তার ম্যাও ধরা জে-পি কেমিক্যাল্‌সের কাজ নয়।

—কনকবাবু থাকেন এখানে?

কনকেন্দু ফিরে তাকালো। দোরগোড়ায় বিহারী।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, বিহারী যে! তুমি এখানে কোত্থেকে?

বিহারী ঘরে এল। মেজের ওপর বসে পড়ে বললে, পেটের দায়ে আসতে হল কলকাতায়। তোমার ঠিকানা পেয়ে একবার দেখা করতে এলাম মামু।

কনকেন্দু প্রসন্ন হতে পারল না। বিহারী দেশের ছেলে—দূর সম্পর্কে কী রকম যেন ভাগ্‌নে হয়। পাড়াগাঁয়ে থাকত, আর মধ্যে মধ্যে শহরে ওদের বাড়িতে এসে হানা দিত। এবং যে কদিন থাকত, সে ক'দিন আর স্বস্তি মিলত না কনকেন্দুর। তটস্থ থাকতে হত সারাক্ষণ—কারণ, কিঞ্চিৎ হাতটান ছিল ওর।

তেইশ-চব্বিশ বছরের গাঁটাগোঁট্টা মিশকালো জোয়ান বিহারী। মুখে কতকগুলো শুকনো ব্রণের দাগ। লেখাপড়া গ্রামের স্কুলে দিনকতক করেছিল,

তারপর মন্ত্র নিলে : 'মৎস্য মারিবে খাইবে সুখে।' কিন্তু কেবল মৎস্য মারলেই তো হয়না—মৎস্য দিয়ে খাওয়ার জন্যে আরো কিছু চাই। বিহারীর বাপ সেদিক থেকে কিছু রেখে যাননি যৎকিঞ্চিৎ পিতৃঋণ ছাড়া। অতএব চাকরীর সন্ধানে বিহারী প্রায়ই আসত শহরে। ওই বিদ্যে নিয়ে চাকরী জোটেনা, সুতরাং বাড়ি থেকে কিছু টাকা নিয়ে এবং কনকেন্দুর কাছ থেকে কিছু বিড়ি সিগারেটের পয়সা দোহন করে বিহারী দেশে ফিরে যেত।

এ হেন ব্যক্তিটির এখানেও আবির্ভাবটা খুব আরামের মনে হল না। যেখানে পাইস হোটেলের খরচা বাবদ প্রতিটি পয়সার হিসেব করতে হয়, সেখানে আতিথেয়তার সৌজন্য সহজ নয় আর।

—আছো কোথায়?

—মানিকতলায় এক বন্ধুর ওখানে উঠেছি।

—কাজকর্মের কিছু সুবিধে হল?

—এখনো হয়নি, তবে আশা করছি।

—ওঃ?—কনকেন্দু চুপ করে গেল। তারপর অস্বস্তিভরা মন নিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল টাকা ধার চাইবার অনিবার্য প্রস্তাবটির জন্যে।

বিহারী হাসল।

—তুমি যা ভাবছ সে আমি বুঝতে পেরেছি মামু। কিন্তু ভয় নেই, এবার আর তোমার কাছে টাকা চাইব না। আমারও একটা চক্ষুলজ্জা আছে।

—আছে নাকি?—কনকেন্দু হেসে ফেলল।

বিহারী যেন ব্যথা পেল : মামু, তোমরা কি মনে করো, আমি চিরদিন একটা বয়াটে হয়েই থাকব? আমিও কি কোনোদিন মানুষ হতে পারবনা?

বলে কী! এ যে ভূতের মুখে রামনাম শোনা যাচ্ছে! কনকেন্দু অবাক হয়ে বিহারীর দিকে তাকালো।

কিছু বলতে গিয়েও বিহারী থামল। আবার সেই পাড়া-কাঁপানো গানের হল্লোড় উঠেছে : 'প্রাণ পিয়ালা ভরা মধু—পিয়ো পিয়ো রসিক বঁধু!' চিৎ-কারের উদ্দামতা একটু মন্দা হয়ে এলে বিহারী আবার কথা শুরু করল।

—আমাকে যতই অপদার্থ ভাবো মামু—আমারও একটা কৃতজ্ঞতা

আছে। আমার অনেক উপকার তুমি করেছ, তার একটুখানি ঋণ আমি শোধ করতে চাই।

কী সর্বনাশ—বিহারী কি ভোজবাজী দেখাতে চায় নাকি! যে বিহারী একটা কথা গুছিয়ে বলতে দশবার হোঁচট খেত—সে যেন ছাপার হরফে কথা কইছে! কলকাতার মহিমা আছে বটে—হাওয়া গায়ে লাগতে না লাগতেই একেবারে মূকং করোতি বাচালং! কিন্তু হঠাৎ এসব বড় বড় কথা বলবার মানে কী? ঋণ শোধ করতে এসেছে—রাতারাতি ডার্বির বাজী জিতে বসেছে নাকি ছোকরা? অবশ্য, ডার্বির টিকেট কেনবার টাকাটা কারো কাছ থেকে ধার করতে পারলেই তবেই।

—তোমার মতলবটা কী খুলে বলো তো?

—মতলব কিছু খারাপ নয় মামু। আজ যে সুযোগ তোমার জন্যে আমি এনেছি, সারা জীবনে তুমি তা দু'বার আর পাবে না। আমি তোমাকে বড়-লোক করে দিতে চাই।

—বড়লোক! কনকেন্দু আকাশ থেকে পড়ল।

—আমি তোমাকে দশ হাজার টাকা পাইয়ে দিতে পারি—চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে সুনিশ্চিত গলায় বিহারী বললে। কালিপড়া কোটরের ভেতরে চোখ দুটো জলজল করে উঠল তার!

—দশ হাজার টাকা!

—দু' এক হাজার বেশি ছাড়া কম নয়!

যেন দম আটকে আসছে এই ভাবে বার কয়েক শ্বাস টানল কনকেন্দু: কী আবোল-তাবোল বকছ বিহারী? দশ হাজার টাকা! তুমি কি লাখো-পতি হয়েছে নাকি আজকাল? কই, চেহারা দেখে তো সে রকম বোধ হচ্ছেনা। মাথা টাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো?

—ভেবোনা মামু, আমার মাথা ঠিকই আছে।

হঠাৎ সমাধান এসে গেল।

—ব্যাপার কী? লটারীর টিকিট বেচতে চাও নাকি?

—না।—বিহারী হাসল।

—কী বললে, খুলে বলো !—কনকেন্দু অধৈর্য হয়ে উঠল : ওরকম টিপে টিপে কথা ছাড়ছ কেন ? মনে মনে কী গাঁজাখুরি গল্প আঁটছ, পরিষ্কার বলে ফেলো সেটা।

বিহারী কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইল। বিড় বিড় করে কিছু আওড়াল, যেন কী একটা মুখস্থ করবে। তারপর আড়চোখে চারদিকে তাকিয়ে বললে, একটা হিন্দুস্থানী চাকর আমার আশ্রয়ে এসে আছে।

—তা থেকে কিছুই বোঝা গেলনা।

বিহারী বললে, এখনি বুঝবে। এ লোকটা বড়বাজারের এক মাড়োয়ারীর বাড়িতে চাকরী করত। হঠাৎ সে বাড়িতে আগুন লাগে। সেই ফাঁকে ডামাডোলে অনেকগুলো গিনি আর একশো টাকার নোট সরিয়েছে। জিনিষ-গুলোর আসল দাম সে জানেনা, তা ছাড়া পুলিসের হাতে পড়বার ভয়ও আছে। তাই যত তাড়াতাড়ি পারে ওগুলোর বিলি-ব্যবস্থা করে সে দেশে সরে পড়তে চায়। শ' পাচেক টাকা পেলেই সেদ শ বারো হাজার টাকার জিনিষ অক্লেশে ছেড়ে দেবে। তুমি যদি পাঁচশো টাকার জোগাড় করতে পারো মামু, তা হলেই রাতারাতি বড়লোক !

কনকেন্দু হেসে উঠল : দিব্যি গুছিয়ে বললে গল্পটা। শুনতে চমৎকার লাগল।

বিহারী উত্তেজিত হয়ে উঠল : তুমি গল্প ভাবছ একে ?—আরো বিশস্ত ভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল : তুমি যদি এখনি আমার সঙ্গে চলো—হাতে-নাতে প্রমাণ দিতে পারি।

—ভুল করছ বিহারী। শিকার ধরার জায়গা ঠাহর করতে পারোনি ঠিক।

—আমাকে তুমি অবিশ্বাস করছ মামু ?—বিহারীর চোখ-মুখ করুণ হয়ে উঠল : ভাবছ এতই অধঃপাতে গেছি আমি ? দোহাই তোমার, একবার চলো আমার সঙ্গে। নিজের চোখেই দেখবে আমি মিথ্যে বলছি কিনা।

—আচ্ছা, মেনে নিচ্ছি তোমার উদ্দেশ্য সাধু। কিন্তু এ ব্যাপারে তোমার কী স্বার্থ ?

—কেন, কমিশন ? টেন পার্সেন্ট্। তুমি যদি দশ হাজার টাকা লাভ করতে পারো—এক হাজার আমার। পাঁচশো টাকার বদলে ন হাজার নেহাৎ মন্দ লাভ নয়।

—এতটাই যখন করলে, তখন ও-টাকাটার ব্যবস্থাই বা নিজে করছনা কেন ?

—পাঁচশো টাকা জোগাড় করবার উপায়ই যদি থাকত মামু, তা হলে কি নিজের সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতাম, না তোমার কাছে এসে ধর্ণা দিতাম ? ভাবলাম, নিজে যদি নাই-ই পাই, অন্তত আমার আত্মীয়-স্বজন কেউ পাক। এমন একটা সুযোগকে কিছুতেই বেহাত হতে দেওয়া যায়না। -- বিহারী একটা লুব্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ঠিক বিশ্বাস করা যায়না—অথচ অবিশ্বাস করবার মতো কারণও দেখা যাচ্ছেনা কিছু। হয়তো সত্যি সত্যিই সদুদ্দেশ্য আছে লোকটার। কিন্তু পাঁচশো টাকা ! একসঙ্গে অতগুলো টাকা কবে দেখেছে, তাই যে সে মনে করতে পারেনা !

কনকেন্দু হাসল : কিন্তু আমাকে মিথ্যে লোভ দেখাচ্ছ বিহারী। ফুটো পকেটে হাত ঢোকাচ্ছ মণি-ব্যাগের সন্ধানে। পাঁচশো কেন পাঁচ টাকায় সঙ্গতিও নেই আমার। আমার মেসের চেহারা দেখে কি মনে হচ্ছে, ইচ্ছে করলেই আমি পাঁচশো টাকা বের করতে পারি ?

বিহারী বললে, তোমার না থাক, কারো কাছ থেকে ধার করতে পারো নাকি ? তিনদিনেই তো শোধ করতে পারবে।

—কে আমাকে ধার দেবে ?

—কেন, কোনো বন্ধু ?

—না, অমন লক্ষ্মীমন্ত বন্ধু আমার কেউ নেই। যারা আছে, তাদের অবস্থা আমার চাইতেও খারাপ।

হতাশমুখে বিহারী চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। বাইরে শীতের নিরুত্তাপ দুপুর। সেলাইয়ের কলটা এতক্ষণ চুপ করে ছিল, হঠাৎ বেজে উঠল ঘট্ ঘট্ খর্ খর্ করে। যাত্রার দলের গান থেমেছে, ওদেরও এতক্ষণে ক্লান্তি এসেছে তা হলে !

কনকেন্দু আশ্বাস দিয়ে বললে, যাও, আর কোথাও চেষ্টা করো। যে ফাঁদ পেতেছ, শিকার ধরতে পারবে নির্ঘাৎ।

—এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না ?—বিহারীর মুখে নিদারুণ মর্মজ্বালা।

—বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়।

—বেশ, চলো আমার সঙ্গে।

—কোথায় ?

বিহারী বললে, তোমাকে একবার জিনিসগুলো দেখাতে চাই আমি।

—কোনো দরকার নেই।

কিন্তু বিহারী নাছোড়বান্দা : নাও না-নাও, একবার দেখতে দোষ কি ?

—কোথায় কোন্ গলিতে ঢুকিয়ে ছোরা বের করবেনা শেষে ?

বিহারীর চোখ যেন হঠাৎ ছল্‌ছল্ করে উঠল : মামু, শেষ পর্যন্ত আমার সম্বন্ধে এই ধারণাই তোমার হল ? আর রাহাজানিই যদি করতে হয়, তা হলে সেজন্যে অন্য লোক আছে। তবু যখন এতই অবিশ্বাস করছ, তখন আমিও তোমার সন্দেহ জাগাতে চাই না। বেলা বারোটার সময় কাছাকাছি এই শ্যাম-স্কোয়ারে গেলে নিশ্চয় গুণ্ডার হাতে পড়বে না ?

—না, অতটা আশঙ্কা হচ্ছে না। অন্তত শ্যাম-স্কোয়ারে তো নয় নিশ্চয়ই।

—তবে কথা রইল। সোমবার সাড়ে এগারোটা নাগাদ এসে আমি তোমায় নিয়ে যাব ওখানে।

বিহারী উঠে দাঁড়ালো।

—কিন্তু শোনো—শোনো—কনকেন্দু বলতে চাইল।

শোনবার কিছু নেই। কাল আমি তোমায় নিয়ে যাব। নাও না-নাও —সে তোমার খুশি। –বিহারী চলে গেল। ভালো করে আবার তাকে ডাকবার আগেই তার জুতোর শব্দ নামতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে।

কোথা থেকে এসে যে জোটে সব! মনে মনে কী যেন মতলব ঠাওরাচ্ছে কে জানে! হতে পারে উদ্দেশ্য অতিশয় মহৎ বিহারীর—তারই কোনো একটা প্রচণ্ড উপকার করবার জন্যে অন্তরাত্মা একেবারে ছটফট করছে তার। কিন্তু এসব উপকারের প্রতি লোভ নেই কনকেন্দুর। অনর্থক উৎপাত যত!

না—যতীন পুতিতুণ্ডির হ্যাণ্ডবিলটাই শেষ করা যাক।: "দক্ষিণ আফ্রিকার মিস্টার ভ্যারেণ্ডাভাজনম্ প্রমুখ বক্তারেই বলেন—"

হঠাৎ ইঁদুরের মতো টিপ্ টিপ্ পা ফেলে প্রাণতোষবাবুর পুনঃপ্রবেশ।

কনকেন্দু চমকে উঠল। অস্বাভাবিক উত্তেজিত প্রাণতোষবাবুর চেহারা, যেন এখনি কাউকে খুন করতে যাবেন—এমনি চোখের দৃষ্টি। শীর্ণ শরীরের সমস্ত রক্ত যেন এসে জমেছে তাঁর মুখে।

ফ্যাস্-ফ্যাস্ করে শিস্‌টানা গলায় প্রাণতোষবাবু বললেন, আমি শুনেছি।

—কী শুনেছেন? শঙ্কিত হয়ে কনকেন্দু প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করল: কী শুনছেন আপনি?

ধপ করে পাশে বসে পড়লেন প্রাণতোষবাবু। তারপরে একেবারে বিহ্বল করে দিয়ে কনকেন্দুর দুখানা পা তিনি জড়িয়ে ধরলেন: আপনি বামুনের ছেলে দাদা—শিক্ষিত লোক। আপনারা হচ্ছেন নির্লোভ—আর লেখাপড়া শিখে অনেক টাকা রোজগারও করতে পারবেন। দোহাই আপনার—আমাকে ওটা পাইয়ে দিন।

সজোরে পা ছাড়িয়ে নিলে কনকেন্দু: কী পাগলের মতো করছেন? কী পাইয়ে দেব আপনাকে?

—টাকা। দশ হাজার টাকা। তিরিশ টাকা মাইনের মুখে ঝাঁটা মেরে ছেড়ে দিয়ে আসব। ব্যবসা করব, স্বাধীন ব্যবসা। কলকাতায় বাসা করব! —মাতালের মতো জড়িয়ে আসতে লাগল প্রাণতোষবাবুর গলা: আমার ইয়ং ওয়াইফ্ মশাই, কোন সাধ-আহ্লাদ তার আমি মেটাতে পারিনি!

—দাঁড়ান, দাঁড়ান—ভাবতে দিন একটু।—কনকেন্দুর ঘোলাটে বুদ্ধিটা একটু একটু করে স্বচ্ছ হয়ে আসতে লাগল: বিহারীর কথাগুলো কানে গেছে বুঝি আপনার?

—কানে গেছে মানে? প্রত্যেকটা শব্দ শুনেছি আমি—প্রত্যেকটা। শনিবারের দিন, তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছি। বাইরে দাঁড়িয়ে ভাবছিলুম, রেসের মাঠে গিয়ে আপনার সেই ম্যাড্ র‍্যাশকেই ধরব কিনা! এমন সময় ভেতর থেকে সব কথা কানে এল। প্রত্যেকটা শব্দ। চোরের

মতো আড়ি পেতে আমি শুনেছি। ম্যাড্‌ র‍্যাশ চুলোয় যাক—ও টাকাটা আপনি আমায় পাইয়ে দিন। আপনার জীবনে অনেক চান্স আসবে, কিন্তু আমি আর সুযোগ পাবনা। দোহাই আপনার, ওটার ওপরে আর লোভ করবেননা।

কনকেন্দু এবারে বিরক্ত হয়ে উঠল।

—আমি লোভ করছি কে বললে আপনাকে?

একটা প্রাণান্ত ব্যাকুলতা ফুটে বেরুতে লাগল প্রাণতোষবাবুর চোখ-মুখ থেকে: আপনার নিজের লোভ না থাক, আর কাউকে তো পাইয়ে দেবার চেষ্টা করবেন আপনি। দু' হাতে ধরে মিনতি করছি মশাই, যা শুনেছেন একেবারে চেপে যান। এবার আমায় চান্স দিন। আপনাকেও আমি কিছু দেব—বঞ্চিত করবনা।

কনকেন্দু বললে, এ তো আচ্ছা জ্বালা। আর বেশ তো, বিহারীর কথায় বিশ্বাস হয়—যান আপনি। ভয় নেই—এক পয়সাও আমাকে দিতে হবেনা আপনার। কাউকে বলতেও যাচ্ছি না আমি।

যেন বুক-ভাঙা একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস পড়ল প্রাণতোষবাবুর: বেশ, সেই কথাই রইল। সোমবার আমিও তবে আপনার সঙ্গে যাব।

—আমার সঙ্গে যাবার দরকার নেই, আপনি একলা গেলেও চলবে। কিন্তু পাঁচশো টাকার জোগাড় আছে তো আপনার?

—হয়েই যাবে এক রকম করে।—ক্ষিপ্তের দৃষ্টি মেলে প্রাণতোষবাবু বললেন: টাকার ব্যবস্থা যেখান থেকে পারি আমি করবই। এ সুযোগ আমি ছাড়বনা। কিন্তু আপনি বলবেননা তো কাউকে?

—না—না।

—কথা রইল তবে। আমি টাকার চেষ্টায় চললাম—প্রায় ঝড়ের বেগে চলে গেলেন ভদ্রলোক।

কনকেন্দু বিমূঢ় হয়ে রইল। পাগল হয়ে যাবে নাকি লোকটা? সমস্ত চেহারায় একটা অসংযত উন্মাদনা—ভয়ঙ্কর কিছু করে না বসলে হয়। টাকা—দশ হাজার টাকা। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাওয়া মাইবের সামনে যেন মরীচিকার হাতছানি। কোথায় গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে মরবে কে জানে!

অস্বস্তিতে সারা গা জ্বালা করতে লাগল। মনে মনে কী ফন্দি আঁটছে বিহারীই বলতে পারে। ওর চোখের দৃষ্টিটা খুব ভালো লাগেনি। হঠাৎ আবছা আবছা ভাবে কী যেন একটা স্মৃতির মধ্যে উঁকি দিতে লাগল। একটা নারী-ঘটিত গোলমালের পর দেশ ছেড়ে কে যেন পলাতক? বিহারী নয়?

উঠে পড়ে কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়ালো। শীতের জল, মাটির কুঁজোর ভেতরে যেন বরফ-গলা হয়ে উঠেছে। কয়েক ঢোঁক খেতেই পেটের মধ্যে থেকে কাঁপুনি উঠতে লাগল গুরগুর করে। যতীনের হ্যাণ্ডবিলটা এক পাশে সরিয়ে রেখে কনকেন্দু কম্বল মুড়ি দিলে—পাশের ঘরের খটখটে সেলাইয়ের কলটা কানের কাছে যেন ঘুম পাড়ানি গান শোনাতে লাগল।....

—জ্বর হইবো, জ্বর হইবো। শীতের দিনে দুফুরে ঘুমাইবেন না অমন কইর‍্যা।

গোকুলবাবু। অফিস থেকে ফিরে এসে ঘোষণা করলেন।

কনকেন্দু ধড়মড় করে উঠে বসল। বাইরে শীতের রোদ লালচে হয়ে এসেছে, ঘরের ভেতরে ঠাণ্ডা ছায়া ঘন হচ্ছে চারদিকে। গোকুলবাবু তাঁর মোটা লাল র‍্যাপারখানা ঝোলাচ্ছেন দড়িতে।

চোখ কচলে বিস্বাদ মুখ নিয়ে কনকেন্দু বললে, হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অফিস থেকে ফিরলেন বুঝি?

গোকুলবাবু গয়ের জামা খুলে নিচের মাদুরটা বিছোলেন। ক্লান্তভাবে বসে পড়ে বললেন, আর করুম কী কন? আমাগরের কী আর মরণের ঠাঁই আছে নি?

—আজ তো শনিবার। এত দেরী হল যে?

—আমাগর আর শনিবার। ওভারটাইম খাইট্‌লাম। দুইটা টাকা বেশি রোজগার কইর্‌তে পাইর্‌লে পোলাপানের দুইটা প্যাটভরা ভাত জুইটবো—গোকুলবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

—নকুলবাবু কোথায়?

—আর কইয়েন না।—গোকুলবাবু হতাশার একটা ভঙ্গি করলেন: দুঃখের

কথা আর কইল্‌বো কি—ওই নোক্‌লাডারে আর মানুষ কইর্‌তে পাইরলাম না। কত কই, নোক্‌লা রে, কনকবাবুরে দেইখ্যা শিক্ষা কর। তা কানে নি যাইবো? কারখানা থেইক্যা বাইর হইয়াই সিনেমা ছাখতে দৌড়াইল।

—তা এক আধটু সিনেমা তো দেখবেনই। সাধ আহ্লাদও তো আছে?

গোকুলবাবুর নরম মেয়েলি মুখখানার ওপর ধিক্কারের রেখা দেখা দিল: ছাড়ান ছান্ কনকবাবু। সিনেমায় আবার ছাখনের আছে কী? যত সমস্ত ফাইজলামি আর বাইজীর নাচ গান। ওই সব দেইখাই ছাশসুদ্ধ লোকের কেরেক্টার নষ্ট হয়। এই যে আপনি আছেন অ্যাডুকেটেড্ ম্যান—কই, আপনারে তো কোনোদিন সিনেমায় দৌড়াইতে দেখিনা।

কনকেন্দু হাসল: অমন প্রশংসাপত্র দেবেননা। মাঝে মাঝে আমিও যাই বই কি সিনেমায়।

কিন্তু গোকুলবাবুর ভক্তি অদম্য: তা হউক—তা হউক। আপনারা তো ওই সব চ্যাংড়ামি দেইখতে যান না। আপনারা হইলেন অ্যাডুকেটেড্ ম্যান—ভালো ভালো ইংরাজী ছবি ছাখেন। আপনি যাই কন কনকবাবু, নোক্‌লার মতিগতি আমার ভালো ঠ্যাকেনা। আপনি একদিন বুজাইয়া কইবেন নোক্‌লারে, আপনার কথা ও শুনবো।

আলোচনা বাড়ানো বৃথা। জবাব দিতে হল: আচ্ছা বলব।

কিন্তু বাইরে পড়ন্ত রোদ। সন্ধ্যা আর একটু পরেই চারদিক কালো করে আসবে। কনকেন্দু উঠল। চা খেতে হবে—একটু বেড়িয়েও আসা দরকার।

রাস্তায় নেমে একবার সে গাঙ্গুলীর দোকানের সামনে দাঁড়ালো। একবার ঢুকবে নাকি ওখানে? উনুনের ওপরে ঘুগনির হাঁড়িতে মশলা আর পেঁয়াজ বাটার একটা লোভনীয় উগ্র তপ্ত গন্ধ উঠছে। বোধ হয় ভালোই লাগে খেতে।

ভাবল, একবার চেখে দেখবে নাকি দু পয়সার ঘুগ্‌নি? লোভ হয় অনেক দিন থেকে। কিন্তু রাত্রের খরিদ্দারের কথা মনে পড়লেই আর প্রবৃত্তি থাকে না—নাড়ীগুলো পাক দিয়ে ওঠে।

দোকানটার ভেতরে একটা চাপা বিশ্রী অন্ধকার। ঢুকতে ইচ্ছে করলনা। ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে যেতে দেখল একটা বড় প্লেট নিয়ে ঘুগনি কিনতে এসেছে চম্পাবতী। শ্যামাদাস না কুঞ্জলালের জন্যে? অথবা দুজনের জন্যেই? বেশ আছে মেয়েটা। দুজনকেই খেলাচ্ছে একসঙ্গে—মাঝে মাঝে সকৌতুকে উপভোগ করছে সুন্দ-উপসুন্দের যুদ্ধ। আশ্চর্য নিষ্ঠুরতা!

কিন্তু নিষ্ঠুরতা?

হঠাৎ গঙ্গার ধারে কুয়াশা-ধূসর শীতার্ত মধ্য রাত্রিটা মনে পড়ল। স্পষ্ট—কোনো ভুল নেই—পোস্তার তলায়, প্রায় গঙ্গার কোল ঘেঁষে রাত্রির প্রেত মূর্তির মতো একা কান্নায় গুমরে মরছিল মেয়েটা। কেন কাঁদছিল, কার জন্যেই বা কাঁদছিল? শ্যামাদাসের দুঃখে, না কুঞ্জলালের বিরহে?

মরুক গে—ওসব ভেবে তার কোনো লাভ নেই। সামনের কোনো একটা দোকান থেকে চা খেয়ে নিতেই হবে আগে। অসময়ে ঘুমিয়ে পড়বার জন্য এখন ঝিম ঝিম করছে মাথার ভেতরে।

দি গ্রীন্ গ্রীল। জীর্ণ একতলা বাড়িতে একটি রেস্তোঁরা। গাঙ্গুলীর চায়ের দোকানের তুলনায় প্রায় গ্র্যাণ্ড হোটেলের সগোত্র। বাইরে একখানা আলকাতরা মাখা কালো বোর্ডে খড়ি দিয়ে লেখা:

চা—৴১০
চপ—/০
কাটলেট—/১০
'টিপিন'—৶০

তলায় ফাউল-কারী থেকে হাঁড়ি-কাবাব পর্যন্ত একটা বিস্তৃত নামের তালিকা, কিন্তু দামের উল্লেখ নেই। বোঝা গেল, ওগুলো অলঙ্করণ—লিখতে হয়, তাই লেখা। গ্রীলের মালিক নিজেই হয়তো কখনো চোখেও দেখেনি হাঁড়ি-কাবাব।

এইখানেই চা পানটা সেরে নেওয়া যাক।

ভেতরে জমাট আবহাওয়া। তিন-চারজন আফিস-ফেরৎ মধ্য-বয়েসী লোক ভূত আছে কিনা তাই নিয়ে তর্ক করছেন। টেবিলে কিল মেরে একজন

বলছেন, স্বচক্ষে দেখেছি—এই যেমন তোমায় দেখছি! বললে পেত্যয় যাবেনা, রাত দুটোর সময় দু' পাশের দুই পাট গুদামে দুখানা পা দিয়ে—

বেশ সরস একটা ভুতুড়ে আবেষ্টনী সৃষ্টি হল সন্ধ্যা-নামা ঘরের ভেতর। রোগা-চেহারার দোকানদার যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করছিলেন, একটা তুড়ি দিয়ে বললেন, দুর্গা—দুর্গা। কী সব বিচ্ছিরি গল্প শুরু করলেন দে মশাই! আমাকে আবার বেশি রাতে কখনো কখনো ও রাস্তা দিয়ে ফিরতে হয়, ভয় ধরিয়ে দিলেন যে।

—ভয় পেলেই ওঁয়ারা আবার ঘাড় চেপে ধরেন। কেন ভয় পেতে যাবে খামোকা? তা হলে একটা ঘটনা বলি তোমায়। হয়েছিল আমাদের দেশে —মানে জয়নগর মজিলপুরে—

—দুখানা গরম গরম কাটলেট্—

সামনের টেবিলে বসে পড়ে কে যেন বললে ভরাট গম্ভীর গলায়। ভুতুড়ে গল্পটা হোঁচট খেল মাঝ রাস্তায়। মুখে ধূসর গোঁফ, মাথায় বারো আনি টাক, গায়ে নীল ব্লেজার কোটের ওপর ছাই রঙের মাফলার। চেয়ারে বসেও একটু একটু টলছে লোকটা। নিঃসন্দেহে মাতাল।

—কই হে, কাটলেট্ হল?

—ভেজে দেব তো বাবু—একটু দেরি হবে।—উত্তর এল পেছন থেকে। কাঠের পার্টিশনের ভেতরে রেলের বুকিং কাউন্টারের মতো গর্ত; ওপারের 'কিচেন' থেকে ওই গর্তটার মারফৎ চা আর খাবার বেরিয়ে আসছে।

—নন্‌সেন্স্, অল বোগাস—লোকটা বিড় বিড় করতে লাগল।

ভূতের গল্প আবার শুরু হয়েছে, কিন্তু তিতকুটে চায়ে চুমুক দিতে দিতে কনকেন্দু দেখতে লাগল লোকটাকেই। পূর্ব বাংলার অতিকায় নদীগুলোতে অনেক তুফানের ঘা খাওয়া বড় বড় নৌকোর সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে লোকটার; ছেঁড়া পাল, ভাঙা দাঁড়—পচে-আসা কাঠের গায়ে মাতাল নদীর স্বাক্ষর। মদন শীলের যুগের শেষ প্রদীপ—উত্তর কলকাতার বাবু-ভদ্রের হুল্লোড়ো বা শেষ-বিগ্রহ।

হাতে একটা মিনার আংটিতে লেখা: প্রমদা। কে প্রমদা? ওঁর স্ত্রী?

অথবা নেশায় টলমলে পা নিয়ে একটু পরেই যার ঘরে শনিবারের রাত কাটাতে যাবেন এ তারই সপ্রেম-স্মারক ?

'ডাক দিলে কে নাম ধরে হায়
আমার পিয়াল বন—'

খ্যামটার সুরে তীক্ষ্ণ গানের আওয়াজ। বারো থেকে আঠারো বছরের কয়েকটা ছেলে বাইজীর মতো ঘুরে ঘুরে নাচছে রাস্তার ওপর—হাততালি দিচ্ছে প্রচণ্ড উল্লাসে। সেই যাত্রার দলের ছোকরারাই সম্ভব। এতক্ষণ ধরে নাচ-গানের মহড়া দিয়ে এইবার বোধ হয় বেরুল নগর-সংকীর্তনে।

চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে কনকেন্দু পথে নামল।

ইলেকট্রিক জ্বলে উঠেছে, গলির মোড়ে মোড়ে মই কাঁধে ঘুরছে গ্যাস-ওয়ালা। টুং টাং করে ঘুরছে রিক্শা। ফিন্‌ফিনে সিল্‌কের পাঞ্জাবীর ওপর শাল চড়ানো দুটি ছোকরা চলে গেল পাশ দিয়ে—গা থেকে ছড়িয়ে গেল উগ্র আতরের গন্ধ।

চারদিকে কেমন একটা চাপা চঞ্চলতা, একটা নেশার আমেজ; গলিতে গলিতে নৈশ-নায়িকাদের প্রতীক্ষা। হঠাৎ মনে হল, এই সন্ধ্যাটা অন্যান্য দিনের মতো নয়—অন্তত এ অঞ্চলে তো নয়ই। শনিবারের শিথিল রাত্রি একটা পঙ্কিল কামনার বিষ-নিশ্বাস ছড়িয়ে দিচ্ছে চারদিকের আকাশে-বাতাসে।

কোন্ দিকে যাওয়া যায় ?

অগত্যা গ্রে স্ট্রীট ধরল। অন্যমনস্কভাবে কয়েক পা হেঁটেই বাঁ দিকের বড় নতুন রাস্তা ধরে এসেই ছোট পার্কটা। কিছুক্ষণ এখানেই বসা যেতে পারে।

শীতের সন্ধ্যায় পার্কে ভিড় নেই। চারদিকের উজ্জ্বল-আলোকিত প্রাসাদের মতো বাড়ি। ঠিক তাদের মাঝখানে একটুকরো ঘন ঘাসের জমি আর স্তিমিত আলোর ক্রোড়পত্র। দু একটি গাছও থমকে আছে এখানে ওখানে—তাদের পাতায় পাতায় শিশিরের সজলতা।

একটা বেঞ্চিতেই বসা যাক। এই নির্জনতায় কিছুক্ষণ মনে পড়ুক পূর্ব বাংলাকে। এই স্তিমিত অন্ধকারে খানিকক্ষণের জন্যে কাছে এসে দাঁড়াক ফেলে-আসা রূপশ্রী।

কিন্তু বেশিক্ষণ একা বসা গেলনা। গাছের তলা থেকে কে একজন পাশে এগিয়ে এল ছায়ার মতো। সে রূপশ্রী নয়।

—পার্কার ফাউন্টেন্ পেন নেবেন দাদা, পার্কার ফাউন্টেন্ পেন?

সবিস্ময়ে ফিরে তাকালো কনকেন্দু। অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্তি দেখা গেল হাফশার্ট পরা একটি বেঁটে মানুষের।

—ফাউন্টেন পেন? কী হবে?

—কেন, লিখবেন! মাত্র পাঁচ টাকায় দেব—লোকটা হাত বাড়িয়ে দিলে সামনের দিকে। তার মুঠোর ওপর দূরের ইলেকট্রিকের আলো পড়ল, চক চক করছে একটা দামী কলম!

—না, দরকার নেই।

—তিন টাকায় নিন্ তা হলে, মাত্র তিন টাকা! বাজারে বাইশ টাকা দাম—

—বলছি দরকার নেই—কনকেন্দু ধমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে হাতখানা গুটিয়ে গেল পেছনে, মিলিয়ে গেল ছায়ামূর্তিটা।

তিন টাকা নয়, আনা ছয়েক আছে পকেটে। প্রথমটা বলেছিল নিরাশা-ভরা লোভের সঙ্গে, এখন খেয়াল হল চোরাই মাল। পকেটমার ছাড়া বাইশ টাকার কলম কেউ বেচতে আসেনা তিন টাকায়। পুলিসের হাতে ধরিয়ে দিলে হত লোকটাকে। কিন্তু তখনি মনে পড়ল, সঙ্গে ছোরা থাকে ওদের। হয়তো তিন টাকার প্রস্তাব দিয়ে একবার যাচাই করে দেখতে চাইল ওর মণি-ব্যাগ, তার পরেই ছোরা বের করত।

অস্বস্তিভরে কনকেন্দু নড়ে উঠল। চারদিকে তাকিয়ে দেখল পার্ক প্রায় জনশূন্য। কেমন একটা ভয় ধরল মনে। একটু আগেই তিন টাকায় যে কলম বেচতে এসেছিল, তার পকেটের কলমটাও সংগ্রহ করবার জন্যে সে এগিয়ে আসতে পারে। তা ছাড়া এই প্রায়-নির্জন পার্কে চেঁচিয়ে ওঠার আগেই খুন করে হাওয়া হয়ে যেতে পারে।

উঠে পড়তে হল। অসময়ে খানিকটা ঘুমিয়ে ঝিম ঝিম করছে শরীর—

ভেতর থেকে একটা বিশ্রী ঠাণ্ডা উঠছে যেন। তা ছাড়া মাথাটাও কেমন ভার ঠেকছে, সর্দি লেগেছে বোধ হয়। রাত্রে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে থাকার পরিণাম হয়তো। না, মেসের দিকেই ফেরা যাক।

সোজা পথে নন্দরাম সেনের রাস্তা। বাঁ দিকে ঘুরতেই আর একটি অবিদ্যার গলি।

তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যাওয়ার আগেই হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। রকে দাঁড়ানো তিন-চারটি মেয়ের সঙ্গে চিৎকার করে আলাপ করছেন যে লোকটি, তিনি মদন শীলই বটেন!

গাঙ্গুলীর দোকানে সকালবেলার সেই আফিঙে-ঝিমানো লোকটি নন। বেশ সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন, গায়ে বালাপোশ, পায়ে বার্ণিশ করা জুতো। হাতে একখানা ছড়ি।

—বাবু দেখেছিস? ক'টা বাবু দেখেছিস তোরা? তোদের মতো অনেককে হীরে-জহরতে মুড়ে দিয়েছে এই মদন শীল। হাতী আজ দ'য়ে পড়েছে বলেই—

বাকীটা আর শোনা গেলনা, দরকারও ছিলনা শোনবার। মদন শীল নিজের সেই বনেদী আভিজাত্যকে কিছুতেই ভুলতে পারনেনি। আজ নিজেকে তিনি ঘোষণা করেন বকুর মতো অধমদের কাছে, রাস্তার ধারের এই দরিদ্র গণিকাদের শোনান তাঁর অভ্রভেদী একদা-বাবুয়ানার কাহিনী। আজ এদের ঘরে ঢোকবার মতো দর্শনীও তাঁর পকেটে নেই—এই হীনতার বেদনাকে ঢাকা দেন অতীতের বিলাস-স্বপ্নের রোমন্থন করে। এরাও কি হাসে ওঁর দশা দেখে? না—সমবেদনার দীর্ঘশ্বাসও ফেলে কেউ কেউ?

আটাত্তরের একের এ-র দোতলাতে উঠতেই শোনা গেল গানের আওয়াজ। পাশাপাশি দু ঘরেই। এদিকে সাধু তার দলবল নিয়ে খোল বাজিয়ে শুরু করেছেন সংকীর্তন:

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ,

অন্যদিকে গোকুলবাবু আর নকুলবাবুর মিহি-মোটা তারে আরম্ভ হয়েছে গুরু-কীর্তন:

"গুরু হে, বড় আশা ছিল।
আশাবৃক্ষ রোপণ কইর‍্যা বইস্যা ছিলাম বৃক্ষ মূলে হে—
ফল না ধরিল বিরিক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া গৈল—"

অসুস্থ শরীরটা বিতৃষ্ণ হয়ে উঠল। ঘরে ঢুকে একটুখানি শোয়ার আশা এখন বিড়ম্বনা। ছু ঘর থেকে শব্দব্রহ্ম যে ভাবে উদ্দাম হয়ে উঠেছেন, তাতে এক মুহূর্ত টেঁকা যাবেনা ওখানে। তা ছাড়া মেজে কাঁপিয়ে মেলাইয়ের কলটাও চলতে শুরু করেছে কিনা কে জানে। কিছুই বিশ্বাস নেই।

বারান্দার রেলিং ধরে কিছুক্ষণ অনিশ্চয়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। এর পরে কী করবে ঠিক করতে লাগল মনে মনে। আবার গঙ্গার ধার? নাক দিয়ে কাঁচা জল পড়ছে, গঙ্গার হাওয়া লাগলে নির্ঘাত নিমোনিয়া। কী করা যায়?

—বেড়িয়ে ফিরলেন দাদা?

ভূপেন।

—হাঁ, ঘুরতে বেরিয়েছিলাম একটু।

ভূপেন কাছে এগিয়ে এল: একটা খবর দিই আপনাকে। আজ কাকার সঙ্গে প্রায় হাতাহাতি হওয়ার জো হয়েছিল। আর ভালো লাগছেনা কনকদা, ভাবছি এবার চলেই যাব এখান থেকে।

—সেই আগা সাহেব?

—না, না, আগা-টাগা নয়। কাকা আমাকে আজ চাকরী দেবার জন্মে এক মাড়োয়ারীর ওখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। যা হওয়ার সেইখানেই হয়ে গেল।

—একটা কিছু বাগড়া দিয়েছ নিশ্চয়?

—আমি দিইনি। ঘটে গেল! মানে, নেহাৎ অ্যাক্সিডেন্টই বলতে পারেন।

—কী রকম?

—বড়বাজারে ঘিয়ের ব্যবসা। কাকা বেশ ভজিয়ে এনেছিলেন—এখুনি পঁচিশ টাকা মাইনের চাকরী হয়ে যেত। শেঠজী বেশ খুশিই হয়েছিলেন, বলছিলেন, দু'চার মাহিনাকে বাদ আউর পাঁচ টাকা বাঢ়াইয়ে দিব। কিন্তু

আমিই গোলমাল করে ফেললাম। বলে বসলাম : মাফ্ কীজিয়ে শেঠজী আপ্ ঘিউমে কেতনা সাপকা চর্বিসে ভেজাল দেতা হ্যায় ?

এক মুহূর্তে মাথাধরা ভুলে গেল কনকেন্দু : ছি : ছিঃ ভূপেন !

—ছিঃ ছিঃ মানে ?—ভূপেন বললে, সত্যি কথাই তো বলছি। ঘিয়ে সাপ আর শূয়োরের চর্বি মিশিয়ে ব্যবসা না করলে কখনো অতবড় ভুঁড়ি হয় ? গলার আওয়াজ শোনেন না ওদের ? কেমন টিপিক্যাল্ ক্যারেক্টের শব্দ— যেন পেটের ভেতর থেকে ওল্‌টানো গণেশ হাঁক-ডাক করছেন ?

—কী আশ্চর্য, চাকরী চাইতে গিয়ে ওসব যা-তা বলবে ?

—কাকাও তাই বলছিলেন, কিন্তু—ভূপেন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল : জেনে-শুনে ওই সব লোকের চাকরী করব ? আমি স্পষ্ট জবাব দিয়েছি কাকাকে, কুলিগিরি করেও পেট চালাব, তবু ওসব নাস্তি। যার ভুঁড়িতে ঘুষি বসানো উচিত, তাকে তৈল-মর্দন চলবে না।

—কুলিগিরি ?

ভূপেন হাসল : আমার লজ্জা নেই কনকদা। "Proletariats have nothing to lose—"

ভূপেন চলে গেল। আশ্চর্য এই ছেলেটা। আটাত্তরের একের এ-র জীর্ণ দেওয়াল আর ছাতের মতো এখানকার মানুষগুলোও যেন ধ্বংসাবশেষ, গাঙ্গুলীর ভাষায় "হারানো গোরু"। এখানে এই ছেলেটা একেবারে বিস্ময়কর ব্যতিক্রম—এখানকার অন্ধকূপে এক ঝলক দামাল বাতাস। একটু বেশিই দামাল—। ভয় হয়, বেশি দিন এখানে থাকলে বাড়িটাকে ধ্বসিয়েই দেবে হয়তো বা। ওর শক্তি এখানে সইবেনা।

—কনকবাবু বুঝি ? আপনাকেই খুঁজছিলাম।

একটা দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস পড়ল গায়ে। যোগদাবাবু !

—আবার চিঠি লিখতে হবে নাকি ?—কনকেন্দু বিদ্রোহী হয়ে উঠল।

—না, না, তা নয়। দরকারী কথা আছে। আসুন আমার ঘরে।

অসুস্থ শরীরে অসহ্য বিরক্তি এসে উথলে পড়ল। আবার সেই স্ত্রীর

চিঠি—সেই তৃতীয় পক্ষের আলোচনা! কিন্তু ঘরে যাওয়ারও উপায় নেই। গোকুলবাবুদের গান সমানে আসছে :

"বেলা আছে দণ্ড চারি,
পাড়ি কিসে সারি!
ভবনদী তুফান ভারি—তরী কি সে ডুবল
গুরু, বড় আশা ছিল—"

গানের তুফান থেকে আত্মরক্ষা করতে গেলে অগত্যা কিছুক্ষণ যোগদাবাবুর ঘরেই আশ্রয় নিতে হবে। তাই-ই করা যাক।

ঘরে ডেকে এনে কনকেন্দুকে চেয়ার এগিয়ে দিলেন যোগদাবাবু। তারপর শুরু হল প্রশ্নমালা।

—আচ্ছা, আমার স্ত্রীকে কী মনে হয় আপনার?

—আমি কেমন করে জানব বলুন -কনকেন্দু বিব্রত হল : তাঁকে তো আমি চিনি না। তাঁর সঙ্গে দেখাও আমার হয়নি কোনোদিন।

—আহা-হা, চিঠি পড়ে কিছু বুঝলেন না?—যোগদাবাবু পায়ের ঘা-টার ব্যাণ্ডেজের উপর সস্নেহে হাত বুলোতে লাগলেন : মনে হলনা কিছু?

—ভালোই তো মনে হল!

—ভালো না ছাই! -যোগদাবাবু মুখভঙ্গি করলেন : ওসব সাজানো কথা পড়েই বুঝি ভুলেছেন? বয়েস অল্প কিনা, তাই ওসব ছলা-কলায় মজে যান আপনারা। কিন্তু আমি মোক্ষদা সরকারের ছেলে—আমাকে ফাঁকি দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়!

—সবই যদি জানেন -কনকেন্দু বিরক্তিটা এবার স্পষ্ট প্রকাশ করে বসল : তা হলে আমাকে আর জিজ্ঞেস করা কেন?

—আহা-হা চটছেন কেন?—যোগদাবাবু অপ্রতিভ হলেন : আমি বলছিলাম, ওই বিনয়কে সন্দেহ হয় না আপনার? মানে ওই যে জ্ঞাতি দাদা—যাত্রার কেষ্ট ঠাকুরটির মতো এক মাথা বাবরী—গায়ের রংটিও বেশ কটা—

—যাঁকে কখনো দেখিনি—কোনোদিন চিনিনা, মিথ্যে মিথ্যে সন্দেহ করতে যাব কেন তাঁকে?

—তা বটে—তা বটে! যোগদাবাবু মাথা নাড়লেন : আপনি তা বলতে পারেন। ও সব থাক। আমি বলছিলাম—যোগদাবাবু একবার কাশলেন : হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী—এমন কোনো ওষুধ আপনি জানেন? যাতে—

দ্বিধাভরে ভদ্রলোক থামলেন।

—কী ওষুধ?—কনকেন্দু ভ্রূ কুঁচকালো।

—এই মানে যৌবন-টৌবন ফিরে আসে, মানে—

—ডাক্তারের কাছে যাবেন। আমি জানিনে—

সংক্ষেপেই আলোচনা শেষ করে দিয়ে কনকেন্দু বেরিয়ে এল। ক্ষুণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন যোগদাবাবু। থাকুক তাকিয়ে—কনকেন্দু ভাবল। বীভৎস লোক একটা। শুধু পায়েই ঘা নেই—মনের মধ্যেও দুরারোগ্য দুর্গন্ধ ক্ষত।

কনকেন্দু ভাবছিল গঙ্গার দিকেই যাবে, কিন্তু বেরিয়ে এসে টের পাওয়া গেল কীর্তন থেমেছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ঘরে এল।

গান শেষ করে গোকুল-নকুল তখন খেতে যাওয়ার জন্যে জামা পরছেন। কনকেন্দুকে দেখে গোকুলবাবুই সম্ভাষণ করলেন : খাইয়া আইলেননি কনকবাবু?

—না, আজ আর রাতে কিছু খাবো না। শরীর খারাপ—জামাটা খুলে, বিছানা টেনে কনকেন্দু শুয়ে পড়ল।

—জ্বর হইল নাকি? নকুল জানতে চাইল।

—সামান্য সর্দি জ্বরের মতো হয়েছে—ও কিছু না। এক রাত উপোস দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।—কনকেন্দু কম্বল টেনে নিলে গায়ে।

—সেই ভালো হইব। আইজ রাত্তিরটা উপোস দেন—গোকুলবাবু সস্নেহে উপদেশ দিলেন। তারপর দু ভাই বেরিয়ে গেলেন শ্যামদাসের হোটেলের সন্ধানে।

চোখ জ্বালা করছে, ঘরের আলোটা খোঁচা মারছে দুটো পাতায়। লাইটটা নিবিয়ে দিলে হত। কিন্তু ওভারশিয়ার সুদাম পাল টি-স্কোয়ার আর ব্লু-প্রিন্ট নিয়ে কিসের একটা প্ল্যান দেখছে নিবিষ্টচিত্তে। চোখ বুজতে চেষ্টা করেও কনকেন্দু পারলনা—কথা কইতে ইচ্ছে করল হঠাৎ। একবার ভাবল

পিতা-পুত্র সংবাদটা আবার একটু ভালো করে যাচাই করে নেয়। কিঞ্চিৎ উপদেশ নেয়ঃ যত দোষই করুক, তবু বাপ তো বটেই!—কিন্তু চর্চাটা অনধিকার—হয়তো অনাবশ্যকও।

—আপনার বন্ধুটির খবর কী? ও সুদামবাবু? কাল থেকে তো দেখছিনা তাঁকে?

—কে? পুতিতুণ্ডি?—প্ল্যান থেকে মুখ না তুলেই সুদাম বললে, ওর মাঝে মাঝে ওরকম হয়। যা-তা জিনিস বিক্রী করে বেড়ায়, কেউ ধরে ঠেঙিয়েছে হয়তো। হাত পা ভেঙে পড়ে আছে কোথাও।

আদর্শ বন্ধু-প্রীতি! কনকেন্দুর হাসি এল।

সুদাম অন্যমনস্কভাবে বলে চলল, ওকেও দোষ দিইনা। দেশে বিধবা মা, তিন চারটে ভাইবোন। একটা ভাই যক্ষ্মায় ভুগছে, তাকে রেখেছে যাদবপুরে। তার তো অঢেল খরচা। তারপরে অতগুলো প্রাণীর মুখের ভাতও জোটাতে হয়। চাকরী-বাকরী পায়নি, করতে তো হবে একটা কিছু!

কনকেন্দু চুপ করে গেল। হাঁ—করতেই হবে একটা কিছু। যক্ষ্মারোগী একটি ভাই, এতগুলি নির্ভরশীল ক্ষুধিত প্রাণী। দোষ নেই যতীন পুতিতুণ্ডির। নিজেকে বাঁচাতে হবে। নীতিশাস্ত্রের দোহাই মেনে চললে তার পেট ভরবেনা। হাঁ, ভালো একটা হ্যাণ্ডবিল লিখেই দিতে হবে পুতিতুণ্ডিকে।

আলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কনকেন্দু ভাবতে লাগল। তারপর কখন যে ঘুম এল, নিজেই জানেনা।

ঘুম ভাঙল একটা চাপা কান্নার শব্দে। ঘরে কালি-ঢালা নিথর রাত্রি। সুদাম আর নকুল গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। শুধু পাশের বিছানায় লেপের নিচে গুমরে গুমরে কাঁদছেন গোকুলবাবু।

—গোকুলবাবু—ও গোকুলবাবু! কী হল আপনার?

—জাইগ্‌লেননি কনকবাবু?—গোকুলবাবু ফোঁপাতে ফোঁপাতে চাপা গলায় বললেন, আস্তে কইয়েন, আস্তে কইয়েন। নোক্‌লা শুইন্‌বার পাইবো।

—ব্যাপার কী? কী হয়েছে?

—পাপ কইরছি কনকবাবু—গোকুলবাবু কান্না চাপতে চেষ্টা করলেন।

—পাপ!

—স্বপ্ন দেইখ্‌লাম কি জানেন?—গোকুলবাবু ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে বলতে লাগলেন: আমি নি এক পরস্ত্রীর হাত ধইর‍্যা টান মারছি! ওঃ হোঃ হোঃ! সঙ্গে সঙ্গে জাইগা গেলাম। মাথার উপর গুরু আছেন, এ কি পাপ-স্বপ্ন দেইখ্‌লাম! কনকবাবু, পরকালে আমার গতি হইবো কী! ওঃ-হো-হো—

বিহ্বল কনকেন্দু শুনতে লাগল, বালিশে মুখ গুঁজে পুণ্যাত্মা গোকুলবাবু অনুতাপের কান্না রোধ করতে চেষ্টা করছেন!

সাত

যাবে কি যাবেনা ভাবতে ভাবতেই কনকেন্দু ট্রামে উঠল। তারপর মনের সেই অনিশ্চয়তার মধ্যে পীড়িত হতে হতেই এক সময় কখন সে গাড়ি বদলে চাপল ওয়েলেসলি-গড়িয়ার ট্রামে, একেবারে নামল এসে আমির আলি অ্যাভিনিউয়ে।

রাস্তাটা পাশেই পড়ে আছে। সামনের বাড়িটার নম্বর স্পষ্ট বলে দিচ্ছে --বড় জোর মিনিট দুয়েকের বেশি তাকে হাঁটতে হবেনা।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ফুটপাথে। কিছুক্ষণের জন্য ভাবা—আবার ফিরে গেলে কেমন হয়? সে জানে মিলবেনা - সুর মিলবেনা এখানে। পূর্ববঙ্গের সেই চন্দনবর্ণা নদীটি, সেই সারি দেওয়া সুপারীর আন্দোলিত সঘন সবুজ; সেই ঝাউবনের স্বনন। সে যেন স্বপ্নে দেখা দেশ। কিছু হাওয়া অবশ্য এখানে আছে, আছে হাওয়া-লাগা দুটি চারটি গাছের ছায়া—কিন্তু! কিন্তু তার আড়ালে বাড়িগুলো মনে করিয়ে দিচ্ছে—এখানে সে ছন্দ-পতন। অনাহূত।

রাগ হতে লাগল রূপশ্রীর ওপরে। কেন এমনভাবে অহেতুক তাকে বিপন্ন করা? কেন মিছেমিছি টেনে আনা এই নিতান্ত অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে? আটাত্তরের একের এ-তে যে হারিয়ে গেছে নিজের যথাস্থানে, কেন তাকে এমন ভাবে প্রলুব্ধ করা?

তবু যখন এসেই পড়েছে, তখন আর ফিরে যাওয়ার কথা ভাবা চলেনা। জোর করেই সাহস টেনে আনল কনকেন্দু। যেন একটা কঠিন কথা বলবে রূপশ্রীকে, এমনি সঙ্কল্প নিয়ে বড় বড় পায়ে অগ্রসর হল।

হলদে রঙের তিনতলা নতুন কেতার বাড়ি। ফটকের ওপরে আইভির ঝাড়। এইটেই আটনম্বর বাড়ি। আর নিচের দরজাতেই কালো প্লেট—এস্ মুখার্জি, পি এইচ্-ডি।

শঙ্করদা তবে ডক্টরেট হয়েছেন! হওয়াই উচিত—আরো আগেই না

আশ্চর্য ছিল। সমস্ত অস্বস্তি ছাপিয়ে খুশিতে ভরে উঠল মনটা। দরজার কড়ায় নাড়া দিলে।

শঙ্করদা নিজেই দরজা খুললেন। পুরু চশমার আড়ালে প্রতিভা-শাণিত চোখ স্নিগ্ধ হয়ে এল সস্নেহ কোমলতায়। শঙ্করদা ডাকলেন, কনক? আয়, হতভাগা আয়—

প্রণাম করার সুযোগ দিলেন না, তার আগেই তুলে নিলেন বলিষ্ঠ বাহুতে। প্রায় বুকের মধ্যে করেই টেনে নিয়ে গেলেন পড়ার ঘরে। চিৎকার করে ডাকলেন, টুনটুনি – কনক এসেছে।

পর্দা ঠেলে সদ্যোস্নাতা রূপশ্রী ঢুকল। বললে, আসতে কি চান নাকি? কত সেধে আনতে হয়েছে।

—একদম মিথ্যে কথা শঙ্করদা, বিশ্বাস করবেননা।—কনকেন্দু প্রতিবাদ করল।

শঙ্করদা বললেন, ঝগড়া পরে হবে। এখন যা, চা আন।

মনের ওপর থেকে কখন সরে গেল পর্দার আড়াল, কখন সূর্যের আলো পড়া কুয়াশার মতো সরে গেল সংশয়। শঙ্করদার ব্যক্তিত্ব কিছুক্ষণের মধ্যেই ভুলিয়ে দিল আটাত্তরের একের-এ বাড়িটা—ভুলিয়ে দিল গোকুল-নকুল-যোগদা-যতীন-শ্যামাদাস-প্রাণতোষকে। কাব্য, উপন্যাস, দর্শন, সমাজ বিজ্ঞান, আর্ট। কনকেন্দুর মনে রইলনা পায়ের বাটার চটিকে, গায়ের ফ্ল্যানেলের জীর্ণ পাঞ্জাবীকে, পকেটের ট্রাম ভাড়ার সামান্য কয়েকটা মাত্র পয়সাকে! বই আর ছবিতে ঠাসা এই ছোট ঘরখানিতে সমুদ্রের ঢেউ এল—কখন তার মধ্যে তলিয়ে গেল কনকেন্দু, টেরও পেলনা বাইরের এক এক ঝলক হাওয়ায় রূপশ্রীর শাড়ির আঁচল উড়ে উড়ে তারই গায়ে এসে পড়ছে।

যখন বেরিয়ে এল, তখন নিজের মধ্যে একটা আশ্চর্য পরিপূর্ণতার আনন্দ অনুভব করছে সে। এখানে আসবার আগে বিচ্ছিন্ন রূপশ্রী তার মনকে শঙ্কিত করে রেখেছিল, কিন্তু আসবার পরে সে টের পেয়েছে শঙ্করদার সঙ্গে সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে কোথায় মিলিয়ে যায় রূপশ্রীর নীল-শ্যামলের প্রবাল

দ্বীপ! যারা পৃথিবীর শিল্প-সাহিত্য যখন সূর্যের মতো আলো ছড়ায়, তখন আর সন্ধ্যা নক্ষত্রকে মনেও পড়ে না!

কিন্তু আজ কেমন আশ্বাস পেয়েছে কনকেন্দু, কেমন একটা ভরসা পেয়েছে মনে। এই ভালো হয়েছে—এই ভালো। এখানে আর সেই নিভৃত অবসর-টুকু আসবেনা মুখোমুখি বসে থাকবার, এখানে খুঁজে পাওয়া যাবেনা নীরবতায় মুখর মুহূর্তগুলোকে। মাঝখানে থাকবে কলকাতার আড়াল; আর থাকবে শঙ্করদার ব্যক্তিত্বের আবরণ—তার ভেতর দিয়ে পরস্পরের দিকে কারো নগ্নদৃষ্টি পড়বেনা কখনো। না, এখানে আসতে আর ভয় নেই কনকেন্দুর, ভয় নেই—অন্তত যতক্ষণ শঙ্করদা আছেন!

সাহিত্যের নেশায় অভিভূত মন নিয়েই কনকেন্দু ফিরল মেসে। ফিরল প্রায় বেলা বারোটায়।

সিঁড়ির গোড়ায় প্রচণ্ড ঝগড়া আরম্ভ হয়ে গেছে তখন। একতলা বনাম দোতলা নয়, তিন তরফা। যুযুৎসু শ্যামাদাস আর কুন্দলাল এখন দাঁড়িয়েছে সিঁড়ির নিচে, ওপরে রেলিং ধরে গর্জন করছেন সাধু। একতলার ব্যারাকের মতো ঘরগুলো থেকে শোনা যাচ্ছে উৎকলীয়দের পালটা তর্জন: বিড়ালো মাছো খিবো না তো কী খিবো? পানিতুয়া খিবো? রসগোল্লা খিবো?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভূপেন হাসছিল: না ধাঁই কিড়ি কিড়ি পটোলো ভাজা খিব? বেশ জমেছে কনকদা—কী বলেন, অ্যাঁ?

—ব্যাপারটা কী বলো তো?

ভূপেন জবাব দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই সাধু হুঙ্কার ছাড়লেন: জাত-জন্ম গেল, একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে দেবেনা! এবার ওই বেড়াল আমার ঘরে এলেই গলা টিপে মারব।

—আহা, কী ধার্মিক রে। বেড়াল মারবেন! বেড়াল যে দেবতা, সাধু মহারাজের সেটা জানা নেই বুঝি? কুন্দলাল শুনিয়ে দিলে ব্যঙ্গের স্বরে।

ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিলে ভূপেনই। এই বাড়িতে তিন চারটি সর্বজনীন বিড়াল আছে। তারা কারুর সম্পত্তি নয়, তাদের কোনো কড়ি নেই—কারুর কড়িও ধারে না। প্রত্যেকেই স্বাবলম্বী এবং করিৎকর্মা—চুরি

করে, চড়ুই ধরে, ইঁদুরও শিকার করে কখনো কখনো। রূপের বালাই কারুরই নেই, নেড়ী কুকুরের মতো তাদের বলা যায় নেড়ী বিড়াল। একটির রঙ ঘোর কালো—আয়তনেও সেটি সুবিপুল। ল্যাজ ফুলিয়ে যখন হোটেলের এঁটো কাঁটার সামনে বীরমূর্তিতে দাঁড়ায়, তখন বাকি বিড়ালগুলো পেছিয়ে আসে সভয়ে!

জুতো, খড়ম আর ইট-পাটকেলের অভ্যর্থনা তাদের নিত্য বরাদ্দ। তবু উড়িয়াদের ঘরে কিছু স্নেহ তারা পায়—রাত্রে আশ্রয় নেয় তাদের কাছেই। বোধ হয় আরশোলা মেরে কিছু প্রতিদান দেয়। সুতরাং সাধারণভাবে তারা উড়িয়াদের পোষ্য বলেই পরিচিত।

এদেরই কোনো একজন—সম্ভবত সেই কৃষ্ণমূর্তি—একখানা স্বোপার্জিত ভেট্‌কী মাছের বড় কাঁটা নিয়ে ওপরে এসেছিল। সেটাকে সে চিবিয়েছে সাধুর ঘরে এবং সাধুর ছোলা ভেজানো বাটিটার পাশে বসেই। তাই এই হট্টগোল। ক্রুদ্ধ সাধু একসঙ্গে উড়িয়াদের আর শ্যামাদাসের শ্রাদ্ধ করছে। 'একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদিগড়—'

ভূপেন বললে, সাধুদার চাঁছা গলাখানা দেখেছেন একবার! একেই বলে তপস্যার আশ্চর্য শক্তি! দশ বারোটা মানুষের গলাকে বেমালুম চাপা দিয়ে দিয়েছেন।

শঙ্করদার সমুদ্র থেকে পচা ডোবায় পড়ল যেন। পাশ কাটিয়ে কনকেন্দু উঠে এল ওপরে।

ঘরে আর কেউ নেই। সুদাম কিংবা নকুলকে দেখা গেলনা—তারা বোধ হয় রবিবারের ভ্রমণ সেরে এখনো ফেরেনি। গোকুলবাবু চুপ করে শুয়ে আছেন লাল চাদরটা গায়ে দিয়ে।

—আইসেন কনকবাবু।—বিমর্ষ স্বরে গোকুলবাবু বললেন।

—কী হল আপনার?

গোকুলবাবু উঠে বসলেন: একটা অনুরোধ করুম আপনারে।

—বলুন।

—রাত্তিরের কথাটা কইয়েন না কারো কাছে।

—না, না—আমি কেন বলতে যাব ওসব ?

কনকেন্দু জামা খুলতে লাগল।

গোকুলবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন : মাথার উপরে গুরুদেবের ছবি রাইখ্যা ছি—নাম কীর্তন করি। তাও ক্যান্ যে ওই সব কুচিন্তা উদয় হয় মনে ! ছিঃ—ছিঃ, কী খারাপ স্বপ্ন দেইখ্‌লাম ! আপনি তো অ্যাডুকেটেড ম্যান—কন, কী হইলে ইয়ার প্রাচিত্তির হইবো।

—প্রায়শ্চিত্তের কী আছে ?—কনকেন্দু সান্ত্বনা দিতে চাইল : স্বপ্ন—স্বপ্নই। ওর কি কোনো মাথা মুণ্ডু আছে ?

—না-না, খালি স্বপ্ন হইবো ক্যান ? মনে কুচিন্তা না থাইক্‌লে কি আর কেউ কুস্বপ্ন ছাখে ?—আবার একটা বুকভরা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন গোকুলবাবু : প্রাচিত্তির করতেই হইবো। আইজ সারাদিন উপবাস করুম—চিত্তশুদ্ধি করুম।

—এ বাড়াবাড়ি গোকুলবাবু।

কিন্তু গোকুলবাবু আর জবাব দিলেননা। গুরুর ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন ধ্যানস্থের মতো। কনকেন্দু দেখতে পেল, তাঁর চোখের কোণে জল টলটল করছে।

ওঁর আর ধ্যান ভাঙিয়ে দরকার নেই। স্নান করতেই যাওয়া যাক।

দুপুর বেলা সত্যি সত্যিই উপোস্ দিলেন গোকুলবাবু।

—কী হইছে দাদা, খাইবেন না, ক্যান্ ? নকুল বার বার প্রশ্ন করতে লাগল। শেষে বিরক্ত হয়ে গোকুলবাবু জবাব দিলেন : প্যাট্টা ভুটভাট কইর্‌তেছে, খাইলে অসুখ কইর্‌বো।

বলেই, একবার মিনতিভরা চোখে কনকেন্দুর দিকে তাকিয়ে গোকুলবাবু র‍্যাপারের নিচে ডুব মারলেন।

বাইরে শীতের লাল রোদ চড়া হতে লাগল। পথে কমে এল স্নানযাত্রীদের ভিড়। একটা মড়া গেল বেশ সমারোহ করে—খোল করতাল বাজিয়ে—সংকীর্তনের কলরব তুলে। নিচে যাত্রাদলের ছেলেগুলো এখনো ভ্যাংচাচ্ছে সংকীর্তনকে—মাঝে মাঝে উৎকট ভাবে চেঁচিয়ে উঠছে : 'বলো হরি হরি

বোল্—বুড়োকে খাটে তোল।' পাশের ঘরে সেলাইয়ের কলটা আজ চলছে না—বোধ হয় রবিবারের ছুটি। গাঙ্গুলীর রেস্তোরাঁর স্ফুটন্ত বড় মটরের গন্ধ আসছে এক একটা তপ্ত হওয়ায়।

ভূপেনের দেওয়া বই দুটো খুলে কনকেন্দু পড়তে চেষ্টা করতে লাগল। মন বসছে না—চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে বার বার।

রূপশ্রী—শঙ্করদা। কাল বিকেলেই একবার যেতে হবে ওঁদের ওখানে। আবার নতুন করে একটা মাদকতা যেন অনুভব করছে কনকেন্দু, রূপশ্রীর বিচ্ছিন্ন অস্বস্তিটা মিলিয়ে যাচ্ছে শঙ্করদার একটা মাধুর্যভর, সর্বব্যাপী বৈদগ্ধ্যের নিবিড়তায়।

কিন্তু যতীন পুতিতুণ্ডি? কী হল লোকটার? সেই হ্যাণ্ডবিলের বরাত দিয়ে সেই যে ডুব দিয়েছে এখনো পাত্তা নেই। ফিরি করতে করতে ব্যাণ্ডেল্ ছাড়িয়ে একেবারে চলে গেল নাকি দিল্লী পর্যন্ত?

চাদরের তলায় অনুতপ্ত গোকুলবাবুর দীর্ঘশ্বাস পড়ছে থেকে থেকে। ঘরে আর কেউ নেই—নকুল আর সুদাম পাল তাস খেলতে গেছে পাশের ঘরে। বইয়ের পাতাগুলোর মধ্যে চোখ রেখে কনকেন্দুর মন শূন্য-পরিক্রমা করতে লাগল।

বাইরে আবার একটা সোরগোল উঠল।

—এবার একবার আসুক আগা খাঁ! খুন করে ফেলব—কে যেন চেঁচিয়ে উঠল।

কনকেন্দু বেরিয়ে এল। ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানাঞ্জনবাবু এতদিনে ধরা পড়েছেন কাবুলীওয়ালার পাল্লায়। আর সাক্ষাৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর কথা নেই—কাবুলী একখানা প্রকাণ্ড লাঠি ঝেড়েছে তাঁর মাথায়। হয়ত খুন করেই ফেলত, কিন্তু চারদিক থেকে হৈ হৈ করে লোক ছুটে আসায় রেহাই পেয়েছেন এ যাত্রা। কাবুলী চম্পট দিয়েছে পাশের গলি দিয়ে। এইমাত্র মাথায় পট্টিবাঁধা জ্ঞানাঞ্জনবাবু ফিরছেন হাসপাতাল হয়ে।

চারদিকে প্রবল কোলাহল। কাবুলীকে হাতের কাছে পেলে আটাত্তরের একের-এ-র মানুষগুলো ছিঁড়ে খাবে তাকে। কিন্তু সকলের ভেতরে আশ্চর্য প্রশান্ত জ্ঞানাঞ্জনবাবু।

—ওর আর দোষ কী? টাকা তো লোকটা সত্যিই পাবে!

—মানুষ খুন করবে তাই বলে?—মোক্ষদা সরকারের ছেলে যোগদাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন।

—খুন তো আর করেনি!—তেমুনি ধীর শান্ত জ্ঞানাঞ্জনবাবুর স্বর। বড় বড় দুটো ক্লান্ত চোখে একটা আশ্চর্য ক্ষমা! তাঁর সম্বন্ধে আচমকা একটা শ্রদ্ধা সাড়া দিয়ে উঠল কনকেন্দুর মনে।

ভূপেন এগিয়ে এল: কাকাকে দেখছেন?—চাপা কৌতুকে চোখ মিটমিট করতে লাগল তার: একেবারে সাক্ষাৎ গৌতম বুদ্ধ যাকে বলে! কিংবা মহাপ্রভু নিত্যানন্দ! আগা থাঁর লাঠির ঘা খেয়েও অকাতরে প্রেম বিলোচ্ছেন। —ভূপেন গলা নামাল: তবে কাকাকে তো জানি! ওই পিটিয়েই যেটুকু হাতের সুখ হবে আগাদা'র। একটি পয়সাও উশুল করতে হচ্ছে না!

প্রাণখোলা হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ল।

—তোমার একটু কষ্ট হচ্ছেনা ভূপেন? একটুও মায়া হচ্ছেনা না কাকার জন্যে?

—কেন?

—কী আশ্চর্য! লাঠি মেরে গেল—

—যাবেই তো! সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলির ব্যাপার! কাকা আগা দার টাকা মেরেছেন, আগাদা' লাঠি মেরেছেন। শোধবোধ—

ভূপেন আবার হেসে উঠল।

কিন্তু কনকেন্দু হাসল না। ফিরে এল নিজের ঘরে।

সব আছে—সব আছে এই আটাত্তরের একের-এ-তে। তার মধ্যে জ্ঞানাঞ্জনবাবু আর একজন। ফাটকা বাজারের জুয়া খেলবেন, তবু সহজ বিবেকটুকু বিসর্জন দিতে পারবেন না! কাবলীওয়ালার কাছ থেকে নিজের প্রাপ্যই যেন পেয়েছেন, তার জন্যে না আছে এতটুকু ক্ষোভ—না আছে এতটুকু অভিযোগ!

কিন্তু এত গোলমালেও ব্যাপারের তলা থেকে মুখ বের করলেন না গোকুলবাবু। অনুতাপের অগ্নিজ্বালায় তিনি দগ্ধ হচ্ছেন এখন। ওসব

ছোটখাটো পার্থিব ব্যাপারে তাঁর মন নেই আর।

চারদিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে স্যুটকেশ থেকে ছোট খাতাটা বের করে আনল কনকেন্দু। অনেকদিন পরে আজ আবার তার কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে।

কিন্তু কী কবিতা লিখবে সে?

বিকেলে গাঙ্গুলীর দোকান থেকে চা খেয়ে গঙ্গার দিকেই বেরিয়ে পড়ল। স্ট্র্যাণ্ড ধরে হাঁটবে খানিকটা, মাথাটা কেমন ধরেই আছে দুদিন থেকে। জোর পায়ে খানিকটা না হাঁটলে সেটা ছাড়বেনা।

—শুনছেন?

নারীকণ্ঠের ডাক। কনকেন্দু ফিরে দাঁড়ালো। ফুটপাথের ওধারে মুখের ওপর আধখানা ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে চম্পাবতী—শ্যামাদাসের হোটেলের সেই নায়িকা। কনকেন্দুর মুখে স্পষ্ট অস্বস্তির ছায়া নামল। কী আপদ, এটা আবার ডাকে কেন এমন করে?

—কী বলছেন?

—একটু আসবেন এদিকে? একটা কথা ছিল।

অন্ধকার গঙ্গার ধারে মেয়েটার সেই অদ্ভুত কান্না তার মনে পড়ল। চরম অনিচ্ছা সত্ত্বেও কৌতূহলের পীড়নটা রোধ করা গেল না। অগত্যা এগিয়ে গেল আস্তে আস্তে।

একটা গলির মোড়ে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটা। আঙুল বাড়িয়ে ভেতরে এ'খানা খোলার ঘর দেখিয়ে দিলে। সামনে তার একটা গ্যাস বাতি: ওখানে আমি থাকি।

যাবার আমন্ত্রণ নাকি? শরীরটা শক্ত করে কনকেন্দু দাঁড়ালো। কঠিন ভঙ্গিতে বললে, তা আমি কী করতে পারি?

মেয়েটা সঙ্কুচিত হয়ে গেল। হয়তো নিজের ঘরে একবার আহ্বান করার ইচ্ছেই ছিল তার, কিন্তু আর সাহস পেল না। বললে, হোটেলের চাকরী আসছে মাস থেকে ছেড়েই দেব বাবু। ও আর আমার ভালো লাগেনা।

—বেশ।

—আমি বলছিলাম—চম্পাবতী একটু ইতস্তত করল : আমাকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারেন ? কোনো ভদ্রলোকের বাড়িতে ?

ভদ্রলোকের বাড়িতে চাকরি করার যোগ্যই বটে তুমি—কনকেন্দু ভাবল ! কিন্তু বাজে কথা বলতে প্রবৃত্তি হল না। সংক্ষেপে জবাব দিলে, চেষ্টা করে দেখব এখন। তবে আমার তো বিশেষ চেনাশোনা কেউ নেই কলকাতায়।

চলে যেতে চাইছিল, আবার ডাক এল : শুনুন ?

—আর কী বলবেন ? বললাম তো চেষ্টা করব ! –গলার স্বরে বিরক্তিটা কিছুতেই চাপা রইলনা এবার।

—সেজন্যে নয়।—চম্পাবতী শাড়ির খুঁট আঙুলে জড়াতে লাগল : আপনি আমাদের দেশের লোক। মানপাশার নাম শুনেছেন ? মানপাশা— সরমহল ?

—শুনেছি।

—সেইখানেই আমাদের বাড়ি। আমার বাবার নাম হরকিঙ্কর ভট্টাচার্য। পুরুতগিরি করেন। চেনেন তাঁকে ?

আশ্চর্য নির্লজ্জতা মেয়েটার ! কোথায় নিজেকে সসংকোচে লুকিয়ে রাখবে—তা নয়, সগৌরবে পিতৃপরিচয় দিচ্ছে ! ঘৃণায় শরীরটা জ্বালা করে উঠল।

রুক্ষ গলায় কনকেন্দু বললে, না, আমি তাঁকে চিনিনা।

চম্পাবতী একটু চুপ করে রইল। তারপর কাঁপা হাতখানা খুলে বার করলে দু'খানা দশটাকার নোট আর কয়েক আনা খুচরো পয়সা। মাথা নিচু করে বললে, এই টাকা ক'টা বাবাকে মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দেবেন দয়া করে ? আমি তো লেখাপড়া জানিনা।

কনকেন্দু সরে দাঁড়ালো : আমাকে কেন ? ওসব আর কাউকে দিলেই ভালো হয়।

—না-না, আর কাউকে আমি বিশ্বাস করিনা।—চম্পাবতীর দৃষ্টি আর্ত হয়ে এল : করবেন এই উপকারটুকু ? বড় গরীব আমার বাবা—পেট ভরে

খেতেও পাননা। এই টাকা ক'টা পেলে তাঁর বড় উপকার হবে। তাঁর নাম আর পোস্ট-অফিস মানপাশা লিখলেই পাবেন তিনি।

নোট দুটোকে কেমন ক্লেদাক্ত মনে হচ্ছে, তবু প্রত্যাখ্যান করা গেলনা। কলের মতোই হাত বাড়িয়ে টাকাগুলো তুলে নিলে কনকেন্দু।

—কার নাম লিখব? কে পাঠাচ্ছে?

—কিছু লিখতে হবেনা—হঠাৎ অদ্ভুত আর্তস্বরে চম্পাবতী বললে, কারুর নাম নয়। – তারপর মুখ ফিরিয়ে যেন চোখের জল চাপবার একটা প্রাণপণ চেষ্টা করেই ছুটে পালালো গলির ভেতরে।

বিহ্বল কনকেন্দু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পথ চলতে আরম্ভ করল। হাতের মধ্যে ক্লেদাক্ত নোট দুটো খস্‌খস্ করছে। ইচ্ছে হল ছুড়ে ফেলে দেয়, কিন্তু—!

রাত্রে আবার একটা কাণ্ড হল।

পাত্‌লা ঘুম—মাঝরাতে কিসের চাপা শব্দে ভেঙে গেল তার। কে যেন গোঙাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল, গোকুলবাবু নাকি? তাঁর প্রায়শ্চিত্ত কি এখনো শেষ হয়নি?

কিন্তু না—গোকুলবাবু নয়। এবার সুদাম পাল।

বাপের জন্যে এরও কি মন খারাপ হচ্ছে নাকি? কিন্তু বেঁটে মুগুরের মতো চেহারার এই লোকটার ভেতরে যে এমন পিতৃভক্তির প্রস্রবণ বইছে, এমন তো কখনো ভাবা যায় নি আগে। বিশেষ করে যে-ভাবে সে সেদিন বাপকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল—

একটু অস্বাভাবিক লাগছে যে! মনে হচ্ছে সুদামের যন্ত্রণাটা মনের নয় —শরীরের।

ঘরে নয়, দাঁড়িয়েছে গিয়ে বাইরের বারান্দায়। রেলিঙের ওপর ঝুঁকিয়ে দিয়েছে মাথাটা—দূর থেকে আসা এক টুকরো আলোয় যন্ত্রণা-বিকৃত মুখখানার আভাস পাওয়া যাচ্ছে তার। একটা অদ্ভুত আর্ততা নিয়ে সমানে গোঙিয়ে চলেছে সুদাম।

সভয়ে উঠে পড়ল কনকেন্দু। হল কী লোকটার?

—কী হয়েছে সুদামবাবু? অসুখ-বিসুখ নাকি?

পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই সুদাম চমকে উঠল। তীক্ষ্ণস্বরে বললে, কে?

—আমি কনক। হল কী?

সুদাম যন্ত্রণা-বিকৃত মুখে হাসতে চেষ্টা করল: শুনে আপনার আর কাজ নেই। পাপের শাস্তি পাচ্ছি আমি

এখানেও পাপ! বিস্ময়ের সঙ্গে একটা বিচিত্র কৌতুক বোধ করল কনকেন্দু। আটাত্তরের একের-এ বাড়ীতে শুধু পাপ আর প্রায়শ্চিত্তের পালাই শুরু হল নাকি? আবির্ভাব ঘটল বিবেকের? এমন অদ্ভুত যোগাযোগ তো সহজে দেখা যায়না। জ্ঞানাঞ্জনবাবুরই অদৃশ্য প্রভাব নাকি এটা?

—কী আবার পাপ করলেন মশাই? মাঝ রাতে অনুতাপ হচ্ছে যার জন্যে?

সুদাম প্রেতপাণ্ডুর মুখে আবার বিকৃত হাসি হাসল: পয়সা দিয়ে ফুর্তি করতে গিয়েছিলাম—নিয়ে এসেছি সওদা।—ফিস্ ফিস্ করে বলল, আপনি দেবতার মতো ভালো মানুষ কনকবাবু—সরে দাঁড়ান আমার কাছ থেকে ছোঁবেন না আমাকে।

—ছিঃ ছিঃ—কী বলছেন ওসব!

সুদাম তেমনি ফিস্ ফিস্ করে বললে, সত্যিই বলছি গণোরিয়া ধরেছে আমাকে।

এর পরে সত্যিই আর দাঁড়ানো চলেনা। শরীরের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ বয়ে গেল। প্রায় এক লাফে ঘরের মধ্যে পালিয়ে এল কনকেন্দু— যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালালো বাঘের মুখ থেকে। সভয়ে কম্বলের তলায় মাথা ঢুকিয়ে সে ভাবতে লাগল: এইবারে তার আটাত্তরের একের এ থেকে বাসা ওঠাতে হবে। সে শুনেছে, বড় ছোঁয়াচে গণোরিয়া—ভয়ঙ্কর ছোঁয়াচে!

আর মাঝে মাঝে শুনতে লাগল, রেলিঙে মাথা রেখে তেমনি কঁকিয়ে চলেছে সুদাম পাল।

ভোরবেলায় তরল ঘুমের মধ্যেই আবছা আবছা কানে আসছিল গোকুল নকুলের গুরু-কীর্তন: গুরু হে, পাপের জ্বালায় জ্বইল্যা মরি—

কিন্তু হঠাৎ বিরাম-যতি পড়ল গানের ওপর। কানে গেল নকুলের চিৎকার : কে—কে কাটা পইড়্ছে? যেতো কাটা পইড়্ছে পুত্তিতুণ্ডি?

তীরবেগে উঠে বসল কনকেন্দু।

ভোরের অস্পষ্ট আলোয় ঘরে একটি মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে। মুখটা চেনা। যতীনের কি রকম ভাই হয়—মাঝে মাঝে দেখা করতে আসত।

লোকটা বিবর্ণ মুখে জবাব দিলে, হাঁ, পরশু চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে পা কাটা গিয়েছিল। কাল মারা গেছে বনগাঁর হাসপাতালে। জিনিসপত্রগুলো নিয়ে যেতে এসেছি আমি।

সুদাম পাল একবার উঠে দাঁড়িয়েই ধপ্ করে বসে পড়ল। একটা অস্ফুট শব্দ বেরুল কনকেন্দুর মুখ দিয়ে। ডুকরে কেঁদে উঠলেন গোকুলবাবু।

বিধবা মা, ভাই বোন—একটা ভাই যক্ষ্মায় মরতে চলেছে যাদবপুরের হাসপাতালে। তাতে কী আসে যায়? ট্রেনের থেকে পড়ে মারা গেছে একটা সামান্য ক্যানভাসার -বাক্সে তেল আর মলম ফিরি করে বেড়াত। অমন কত যায়—কে তার খবর রাখে?

জে-পি কেমিক্যাল্সের অপূর্ব আবিষ্কার। সন্ন্যাসী প্রদত্ত মহৌষধ! কিন্তু মরা মানুষ বাঁচাবার কোনো ওষুধ কি আবিষ্কার করতে পারেনি যতীন পুত্তিতুণ্ডি?

আট

কিন্তু কী আর এমন অসামান্য ঘটনা আটাত্তরের একের-এ বাড়িতে? এখানকার মানুষগুলো এ ধরণের মৃত্যুতে খুব বেশি আশ্চর্য হয়না। অপঘাত এখানে গা সওয়া হয়ে গেছে। বরং যে মরে সে-ই বাঁচে—জীবনের দুর্বহ ভারটা নামিয়ে দিয়ে ফেলে স্বস্তির নিশ্বাস।

যতীনের ভাই বাক্স-বিছানা তুলে নিয়ে গেছে, জায়গাটা শূন্য। শুধু তিল তেলের কয়েকটা লেবেল শুকনো পাতার মতো উড়ে বেড়াচ্ছে ঘরময়। কনকেন্দুর চোখ দুটো যেন জ্বালা করতে লাগল। ঘর থেকে বেরিয়ে এল ধীরে ধীরে। গাঙ্গুলীর দোকানেই চা খেতে যাওয়া যাক একবার।

হাঁ, যতীনের কথা মন থেকে মুছে ফেলাই ভালো। কেউ থাকবেনা—কিছুই থাকবেনা। এই আটাত্তরের একের-এ-ই কি থাকবে বেশিদিন? সেদিনই তো শুনছিল, এটাকে ডিমোলিশ্ করবার কথা ভাবছে ইম্প্রুভ্মেণ্ট ট্রাস্ট্। তার চেয়ে ওসব ভাবনা ছেড়ে দিয়ে গাঙ্গুলীর দোকানে বসে বিশ্ব-রাজনীতির খবর নেওয়াই ভালো। হিটলার এ যাত্রা আর একটা বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়েই ছাড়বে। আকাশে বাতাসে সেই আসন্ন ঝড়ের মেঘ জানান দিচ্ছে নিজেকে। সে যুদ্ধে কত যতীন পুতিতুণ্ডির জন্যে রাইফেলের গুলি ওৎ পেতে বসে আছে—কে জানে?

বারান্দায় বেরুতেই প্রায় ছুটতে ছুটতে পাশে এসে দাঁড়ালেন প্রাণতোষ বাবু। অসুস্থ উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা—চোখের দৃষ্টি ঘোলা। কানে কানে জিজ্ঞেস করলে, আজকেই আপনার সেই বিহারীবাবু আসবেন তো?

তিক্ত হয়ে কনকেন্দু বললে, তাইতো বলে গেছে।

—আপনি থাকবেন না দুপুরে?

—আমার ক্লাশ আছে।

—আজ ক্লাশে না গেলে হয় না?

—কী বলছেন যা-তা! ওই বিহারীর জন্যে বসে বসে দুপুরবেলাটা নষ্ট করব? অমন মূল্যবান ব্যক্তি ও নয়!

—বলেন কি—মূল্যবান নয়! নগদ দশ হাজার টাকা—

—আপনি পারেন তো নিন্‌গে। আমার কোনো কৌতূহল নেই।

—কিন্তু আমারই বা কী হবে?—প্রাণতোষবাবু প্রায় কেঁদে ফেললেন: বিহারীবাবু তো আমায়—

—ঠিক চিনবেন। আপনি বসে থাকবেন আমার সীটে-এলে আলাপ করে নেবেন। ভয় নেই, ওর টেন পার্সেন্ট কমিশন নিয়ে কথা—সে আমিই দিই, আর আপনিই দিন।

—তাইতো!—প্রাণতোষবাবু তবু খুঁত খুঁত করতে লাগলেন।

—কিছু ভাববেন না প্রাণতোষবাবু-কনকেন্দু আশ্বাস দিলে: বিহারী শিকার ধরতে এসেছে—ভেড়া ছাগল দুই-ই সমান উপাদেয় ওর কাছে। কিন্তু ভালো করে একবার যাচিয়ে নেবেন মশাই—কিসের থেকে কী হয় বলা যায়না।

প্রাণতোষবাবু হঠাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন: আমাকে ঠকাবে? অসম্ভব। ভালো করে বাজিয়ে না দেখেই টাকা হাতছাড়া করব নাকি? সে হবেনা। কিন্তু—হঠাৎ উৎকণ্ঠার ছায়া পড়ল তাঁর মুখে: আপনি কাউকে কিছু বলেননি তো?

—না, না। নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি।

কনকেন্দু নেমে গেল নিচে। সমস্ত বিস্বাদ লাগছে আজ—একটু জরও যেন হয়েছে। হাতের মধ্যে যতীন পুতিতুণ্ডির জন্যে লেখা হ্যাণ্ডবিলটা ছিল—টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে দিলে হাওয়ায়।

বাড়ি থেকে বেরুতেই যোগদাবাবু।

কেমন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছেন—পায়ের ব্যাণ্ডেজটার ওপর শুকনো রক্তের ছাপ। ধূসর তৈলহীন চুল, গায়ে ধুলো কোট -অদ্ভুত অসুস্থ দেখাচ্ছে লোকটাকে। রাস্তায় সূর্যের আলোয় না দেখলে যেন বুঝতেই পারা যায়না—যোগদাবাবু এতখানি বুড়ো হয়ে গেছেন!

বগলে কালো একটা বোতল। কনকেন্দুর সামনে এসেই সেটা তুলে ধরলেন। আত্মপ্রসাদের হাসিতে গদ গদ হয়ে উঠল মুখ

—কিনে আনলাম মশাই ইলেকট্রিক সালসা। খুব জোর বিজ্ঞাপন দেয়। খেলেই নাকি সত্তর বছরের বৃদ্ধেরও নব-যৌবন ফিরে আসে। আমার তো এখনো পঞ্চান্ন পেরোয়নি—কী বলেন, অ্যাঁ?

—খান গে যান—

কনকেন্দু পাশ কাটালো। অলক্ষ্যে মেঘনাদ বিনয়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন যোগদাবাবু, কিন্তু বড় অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা! বাঁশি বাজায় বিনয়দা, বাবরী রাখে, বয়সে তরুণ। আর পাকধরা মাথার চুল যোগদাবাবুর, কুৎসিত চেহারা—পায়ে পচা ঘা। ইলেকট্রিক সালসার পাশুপত-অস্ত্রে যুদ্ধজয় কি সম্ভব হবে তাঁর পক্ষে?

হাসনুহানা! বড় বেশি কাব্যিক নাম। ক্ষেমঙ্করী কিংবা নগেন্দ্রনন্দিনী হলে আজ কি এমন দুর্ভাবনায় পড়তে হত যোগদাবাবুকে? কে জানে!

রক্তজবার বুকের মধ্যে বসানো একটি কনকচাঁপার কুঁড়ির মতো লাল শাড়িপরা রূপশ্রী দাঁড়িয়েছিল সিঁড়ি আর লিফ্‌টের ঠিক মাঝামাঝি জায়গাটিতে। কনকেন্দুকে দেখেই এগিয়ে এল।

—আপনার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।

করিডোর এবং সিঁড়ির পথে চলন্ত ছেলেদের ঈর্ষ্যাতুর দৃষ্টি অনুভব করতে করতে কনকেন্দু বললে, খবর বলুন।

—দাদা যেতে বলেছেন বিকেলে।

—সে তো কালই বলেছেন।

—কিন্তু আজ আপনাকে মনে করিয়ে দেবার দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন: রূপশ্রী হাসল: আপনি তো সব সময়ে এড়িয়ে চলবার চেষ্টাতেই থাকেন কিনা।

কনকেন্দু মুগ্ধ চোখে একবার তাকালো। এই সেই বিচ্ছিন্ন রূপশ্রী—শঙ্করদার পরিমণ্ডল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই রূপশ্রীকে তার ভয় করে—এই হাসিকে সে বিশ্বাস করতে পারে না, এই চোখের দৃষ্টি তাকে নির্জন সন্ধ্যায়

ঝাউবনের গান শোনায়। আশুতোষ বিল্ডিঙের এই ছন্দোহীন করিডোরটা পর্যন্ত যেন একটা সেতারে পরিণত হয়ে যায়—মনের নায়কী তারের ঝঙ্কার চারদিকের কলরবে যেন সঞ্চারিণীর মত বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ে।

এখানকার আলোচনা সংক্ষেপে শেষ করাই ভালো। কনকেন্দু বললে, নিশ্চয় যাব।

—আমার ছুটি ছুটোয়। এক সঙ্গে যাবেন?

—ছুটো বুঝি বিকেল? আর তখন তো শঙ্করদা ফিরবেন না।

—নাই বা ফিরলেন। গিয়ে গান শোনাবেন।—রূপশ্রী আবার হাসল, টোল খেল গালে।

সীমাহীন প্রলুব্ধি যেন নাড়ী ধরে টান মারল—মাথার মধ্যে ভেঙে পড়ল রক্তের চঞ্চল ঢেউ। কিন্তু –

—না, সেটা ঠিক হবে না।—আর গান গাওয়া ছেড়েও দিয়েছি আজকাল! জোর করেই বলতে হল: চারটে পর্যন্ত ক্লাশ আছে আমার। পাঁচটার মধ্যেই গিয়ে পৌঁছুব।

রূপশ্রী কি ক্ষুণ্ণ হল? একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিল নাকি কোনো কিছুর—জানিয়েছিল নিভৃতির আহ্বান? ঠিক বোঝা গেল না। তবু তার নিজের দিক থেকেই সতর্ক হওয়া উচিত। এবং সেটা যতখানি সম্ভব।

শান্ত গলায় রূপশ্রী বললে, তবে তাই যাবেন—তারপর ক্ষিপ্রবেগে উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। হয়তো চললো লাইব্রেরির উদ্দেশ্যেই।

কনকেন্দু অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে রইল আরো কয়েক মুহূর্ত। অন্যায় করল নাকি—আঘাত দিয়ে বসল নাকি ওকে? একটা মেঘের ছায়া কি ভেসে গেল রূপশ্রীর মুখের ওপর দিয়ে?

—দাদা—

আবার ব্যাঙ ডাকল। একেবারে কানের কাছে। ক্যামেরাধারী সেই চোয়াল-ভাঙা ছোকরাটা। মুখে তেমনি পোড়া সিগারেটের উগ্র গন্ধ। ছোকরার নাম হুরেশ্বর।

হুরেশ্বর কাঁধে হাত রাখল: মাইরি—কী ফাইন হাসি আপনার বান্ধবীর!

ইচ্ছে করছিল, ধাক্কা দিয়ে হাত সরিয়ে দেয় ছোকরার। কিন্তু কী মনে হল কনকেন্দুর, একটা হিংস্রতায় হঠাৎ জ্বলে উঠল তার চোখ।

—কী, আলাপ করবেন ?

সামনে হাঁস দেখে শিয়ালের মুখের চেহারা কেমন হয়, কনকেন্দু তা কোনো দিন দেখেনি। কিন্তু হরেশ্বরের মুখ দেখে যেন খানিকটা আন্দাজ করা গেল তার।

তামাক-পোড়া কালো ঠোঁটটা একবার চেটে নিয়ে হরেশ্বর বললে, দেবেন আলাপ করিয়ে ? মাইরি দাদা—

—থামুন—হরেশ্বরের প্রায় আলিঙ্গনোদ্যত বাহু ঠেলে সরিয়ে দিতে হল তাকে : ছুটির পরে যাবেন আমার সঙ্গে। নিয়ে যাব ওদের বাড়ি।

আনন্দে কিছুক্ষণ যেন হরেশ্বর কথা কইতে পারলনা। তারপর গোটা তিনেক ঢোঁক গিলে বললে, তবে চলুন এবার ইউনিভার্সিটি রেস্তোরাঁয়। চা খেতে খেতে গল্প করা যাক।

—চা-টা বিকেলে ওদের ওখানেই হবে এখন। এখন মাপ করবেন আমাকে, এক্ষুনি আমার একটা টিউটোরিয়াল ক্লাশ আছে।

হরেশ্বরকে প্রায় ধাক্কা দিয়েই কনকেন্দু চলে গেল। ঘণ্টা পড়ে গেছে প্রায় দশ মিনিট।

কিন্তু মাথার মধ্যে সব যেন আজ ফাঁকা হয়ে গেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলেছে—অশ্রান্ত ধৈর্যে আলোচনা করছেন অধ্যাপকেরা, কিন্তু সে আলোচনার একটি বর্ণও যেন বুঝতে পারছেনা সে। চোখের সামনে ক্রমাগত ভাসছে যতীন পুতিতুণ্ডির মুখ : কী আর করা যায় বলুন—চালাতেই তো হবে এক-রকম করে !

আটাত্তরের একের এর সমস্ত বাড়িটা, ওখানকার সমস্ত মানুষগুলো যেন প্রতিফলিত হয়েছে যতীন পুতিতুণ্ডির দর্পণে। কেউ বাদ যাবেনা। এ পরিণাম সকলের—এ যেন সকলেরই একটা অনিবার্য সিদ্ধান্ত। সুদাম পাল—যোগদাবাবু —গোকুলবাবু—নকুলবাবু—সবই যেন একটা অবিচ্ছিন্ন শবযাত্রা।

এরই মাধ্যে হরেশ্বর কখন আগাগোড়া গোয়েন্দার মতো দৃষ্টি রেখেছে তার

ওপর, কনকেন্দু জানত না। কখন ফাঁকি দিয়ে পালাবে, সেজন্য অত্যন্ত সতর্ক হয়েই ছিল হরেশ্বর। চারটের ঘণ্টা বাজতেই ঠিক পাশটিতে এসে দাঁড়ালো: কই, চলুন।

একটুখানি কৌতুকের হাসি ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। মন্দ কী! যদি রূপশ্রীকে বশীভূত করতে পারে—ভালোই তো! খুব সম্ভব বড়লোকের ছেলে, অন্তত বেশ-বাসে সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে তার। একটু ছটফটানি আছে, কিন্তু ওটা যৌবনধর্ম, কিছুদিনের মধ্যেই ওসব রোগের বালাই আর থাকবেনা। রূপশ্রীও সুখীই হবে নিশ্চয়। আর কনকেন্দু? শঙ্করদার সমুদ্র থাকতে তার ভাবনা নেই - তার নিবিড় অতলেই সে তলিয়ে থাকতে পারবে।

ট্রামে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু হরেশ্বরের তাড়া বড্ড বেশি।

—আবার ট্রাম কেন মশাই, ট্যাক্সি নিলেই তো হয়।

—ট্যাক্সি! কী হবে মিথ্যেমিথ্যি খরচ করে?

—যাবেন তো পার্ক সার্কাস?—একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করলে হরেশ্বর: কতই বা খরচ হবে তাতে? ও আমিই দেব। চলুন—ট্যাক্সিতেই যাই—

—কিন্তু—

—কিন্তু আবার কী। বড় জোর দু'টাকা পড়বে। ও দু' দশ টাকার জন্যে হরেশ্বর মল্লিকের কিছু আসে যায় না। বেশ আরামেই যাওয়া যাবে—চলুন—

হরেশ্বর ট্যাক্সি থামিয়ে ফেলল।

কনকেন্দু আর বাধা দিলেনা। যা খুশি করুক আজ—আজকে ওরই দিন। চলন্ত ট্যাক্সির সঙ্গে মাঝে মাঝে আড়চোখে কনকেন্দু লক্ষ্য করতে লাগল হরেশ্বরকে। থেকে থেকে হাতের পিঠে ঠিক করে নিচ্ছে মাথার চুল; একখানা সুরভিত রুমাল বের করে একবার ঘাড় মুছল। কালিপড়া চোখে একটা উৎসুক উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছে তার।

—শুনুন?—হরেশ্বর ডাকল।

—বলতে পারেন।

একবার ঠোঁট চাটল হরেশ্বর : আপনার বান্ধবী কি খুব গম্ভীর ?

—দেখে কি তাই মনে হল ?

—না ইয়ে, তা ঠিক নয় ! কী অদ্ভুত লাভ্‌লি হাসি হাসছিলেন – হরেশ্বর যেন ধ্যান করতে লাগল : আলাপ করবেন তো আমার সঙ্গে ?

—বোবা নয় – সেটাতো দেখেছেন ।

কাটা-কাটা জবাবে যেন অস্বস্তি বোধ করলেন হরেশ্বর । তারপর একটা সিগারেট বার করল, আর একটা এগিয়ে দিলে কনকেন্দুর দিকে ।

—ধন্যবাদ । আমি খাই না ।

—ওঃ, আচ্ছা—হরেশ্বর সিগারেট কেস্‌টা বন্ধ করল, একটা ক্যাব্‌লামির হাসি হেসে বললে, দেখুন দাদা, আপনি যে কী রকম গম্ভীর হয়ে আছেন ! ভয় পাচ্ছেন নাকি ?

—ভয় পাবো কেন ?

—হয়তো ভাবছেন, পাছে আপনার বান্ধবীকে আমি—

কনকেন্দু হাসল : উইন করে নেন—এই তো ? নিশ্চিন্ত থাকুন—আমার বিন্দুমাত্র জেলাসি নেই । যদি পারেন, আমিই কন্‌গ্র্যাচুলেশন জানাব সকলের আগে ।

মেঘ না চাইতেই জল পাওয়ার উল্লাসে হরেশ্বরের চোয়ালভাঙা মুখ ঝলমল করে উঠল ।

—সত্যি বলছেন দাদা ? মন থেকে ?

—মন থেকে বই কি ।

—একটু জেলাসি নেই ?

—এক কণাও না ।

—অনার ব্রাইট ?—আবেগে হরেশ্বর তার হাত চেপে ধরল ।

—অনার ব্রাইট—কনকেন্দু ছাড়িয়ে নিলে হাতটা ।

বাকী পথটা আর কথা বললেনা হরেশ্বর । তন্ময় ভাবে সিগারেট টেনে চলল শুধু । রূপশ্রীকে কী ভাবে, কী মোহন-মন্ত্রে জয় করবে, মনে মনে তারই একটা প্ল্যান আঁটতে লাগল বোধ হয় ।

গাড়ি আমির আলি অ্যাভিনিউয়ে এসে পড়েছে। কনকেন্দু ড্রাইভারকে বললে, ডান দিকের রাস্তা।

—এসে গেলাম ?—চকিত হয়ে উঠল হরেশ্বর।

—হাঁ, এসে গেছি—কনকেন্দু সংক্ষিপ্ত জবাব দিলে।

হরেশ্বর ছটফট করে উঠল। আর একবার হাতের পিঠ দিয়ে চুলটা ঠিক করে নিলে।

কেমন কাঁপা হাতে ট্যাক্সির ভাড়া মেটালো হরেশ্বর। কনকেন্দু আড়-চোখে চেয়ে দেখল। নার্ভাস হয়ে গেছে নাকি ? হঠাৎ ঘাবড়ে গেছে তথাকথিত স্মার্ট ছেলেটি ?

কনকেন্দু কড়া নাড়ল। হরেশ্বর একটা হাসি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করল মুখে—বেশ সপ্রতিভ একটি নায়োকোচিত হাসি। শঙ্করদাই দরজা খুললেন।

আর সঙ্গে সঙ্গে নাটকীয় ব্যাপার ঘটল একটা। হঠাৎ সামনে গোখরো সাপ দেখে লোকে যেমন আত্‌কে সরে যায়, তেমনি করেই পিছিয়ে গেল হরেশ্বর। হাসিটা নিভে গেল চক্ষুর পলকে, বিবর্ণ হয়ে গেল চেহারা, কী একটা বলতে গিয়ে হাঁ করেই বন্ধ করে ফেলল মুখ।

শঙ্কদার চোখ প্রথম পড়ল হরেশ্বরের ওপরেই।

—কি হে, তুমি এখানে ?

—না স্যার, এই ইয়ে—মানে এই রাস্তায় যাচ্ছিলাম, এই আর কি—বলতে বলতেই হরেশ্বর প্রায় লাফ দিয়ে পড়ল রাস্তায়। তারপর ডাইনে-বাঁয়ে না তাকিয়েই হন্‌ হন্‌ করে হাঁটতে লাগল আমির আলি অ্যাভিনিউয়ের দিকে। যেন পালিয়ে বাঁচল।

একটা দুর্বোধ রহস্য ! হতবাক হয়ে কনকেন্দু তাকিয়ে রইল।

শঙ্করদা মুখে একটা ভ্রূকুটি ফুটিয়ে বললে, ওটাকে জোটালি কোত্থেকে ?

—আমাদের ক্লাসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বেড়াতে এসেছিল। চেনেন নাকি ওকে ?

—চিনি মানে ? আমার ছাত্র ছিল কলেজে—মূর্তিমান বাঁদর একটা। নানা কুকীর্তি করে কলেজ থেকে প্রায় এক্‌সপেল্‌ড্‌ ও হচ্ছিল, আমিই বাঁচাই।

সেই থেকে আমাকে যমের মতো ভয় করে। তোর সঙ্গে এল কি বলে? আমার নাম বলিস্‌নি বুঝি?

কেন এসেছিল, বলতে গিয়েও বললেনা কনকেন্দু। বেচারা হৃষেশ্বর! ওর ওপর এখন তার মায়া হচ্ছে। গেল ট্যাক্সি ভাড়ার টাকা—সেই সঙ্গে সারাদিনের আকুল প্রত্যাশা!

কনকেন্দু বললে, তা বলিনি। এদিক দিয়ে যাচ্ছিল, এল আমার সঙ্গে।

—খবর্দার, মিশবিনা ওঁর সঙ্গে। হনুমান অবতার একটা! এখন চল্‌ ভেতরে। একটা প্রবন্ধ লিখতে চেষ্টা করছি আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে। তোর কাছ থেকে মতামত চাই আমার।

বিদ্যা বিনয় দেয়—শঙ্করদার কথাই তার প্রমাণ! তাঁর প্রবন্ধের সম্পর্কে মতামত দেবে সে! কিন্তু কথা আর সে বাড়ালো না, ভেতরে পা দিলে। ঘরে ঢুকতেই দেখা গেল টেবিলের সামনে বসে কী একটা বইয়ের পাতায় একেবারে তলিয়ে আছে রূপশ্রী।

অস্ট্রালয়েডদের সম্বন্ধে একটা নতুন আলোচনা শুরু করেছিলেন শঙ্করদা।

—জানিস, পৃথিবীর আদিম মানুষের ধারা আজও ওদের মধ্যে বইছে। ওরাই বলতে গেলে খাঁটি মনুর সন্তান, অ্যাডামের বংশধর—ওদের মেয়েদের মধ্যেই সেই অ্যাডাম্‌স রিব! কিন্তু ইয়োরোপের মানুষ ওদের শেষ করে আনল—বছরের পর বছর ধরে নিশ্চিহ্ন করে ফেলছে আমাদের খাঁটি পূর্বপুরুষদের। এরই নাম পিতৃহত্যা—প্যাট্রিসাইড্‌! এই অপরাধের জন্যে কেউ ওদের ক্ষমা করবেনা। না ইতিহাস, না বিজ্ঞান!

—বাঁচানোর উপায় নেই?

—সাধ্য কী! ডারউইনের একটা কথা ইয়োরোপ মর্মে মর্মে মেনে নিয়েছে, সে হল সারভাইভ্যাল অব্‌ দি ফিটেস্ট! বিজ্ঞানের ওই তত্ত্বটাকে বেশ করে খাপ খাইয়ে নিয়েছে রাজনীতির সঙ্গে। মানে, সোজা বাংলায় বলতে চায়: নিকাশ করো, দুর্বলকে শেষ করে দাও। এরপর নিজেদের মাংস নিজেরাই ছিঁড়ে খাবে—দেখে নিস! ভালো কথা, ট্রুকোনিনির নাম শুনেছিস কখনো?

—কোনো ইটালিয়ান বুঝি ?

—ধ্যেৎ স্টুপিড্ ! ট্রুকোনিনি হল—

টেবিলের ওপর রূপশ্রী চায়ের ট্রে নামাল। সঙ্গে খাবার।

শঙ্করদা হাসলেন : আচ্ছা, ট্রুকোনিনি থাক, এখন টুন্টুনির খাবার-গুলোকে অভ্যর্থনা জানানো যাক। নে—

কনকেন্দু খাবারের প্লেটটা টেনে নিলে সামনে।

একটা সিঙাড়া চামচে দিয়ে ভাঙতে ভাঙতে শঙ্করদা বললেন, ওঃ হো, সব চেয়ে ইম্পর্টাণ্ট্ খবরটাই যে তোকে দেওয়া হয়নি এখনো। টুন্টুনি যে আসছে মাসে চলে যাচ্ছে। সব রেডি !

কনকেন্দু চকিত হয়ে উঠল !

—কোথায় ?

—লণ্ডনে। অনেক লেখালেখির পরে আসছে মাসে প্যাসেজ্ পাওয়া গেছে। আমার এক মামা লণ্ডনে বাড়ি করে আছেন প্রায় পনেরো বছর—শুনিসনি তাঁর কথা ? ওঃ ! তোকে বলা হয়নি—মানে, উপলক্ষ্য তো হয়নি কখনো। তা মামা এখন বুড়ো হয়ে গেছেন, এক মেম সায়েব মামী ছাড়া ছেলেপুলেও কেউ নেই। মামার ভারী ইচ্ছে—দেশ থেকে কেউ গিয়ে ওঁদের কাছে থাকে। ভাবলাম, টুনটুনিকেই পাঠিয়ে দিই। ওখানেই ফিলসফি পড়বে—সত্যিকারের লেখাপড়াও শিখবে খানিকটা। তুই কী বলিস ?

সূর্যের ওপর থেকে মেঘ সরে গেল। আজ তিন বছর পরে মেঘ সরে গেল তার মন থেকেও। আত্মপ্রবঞ্চনার একটুকু আবরণও আর রইলনা কোথাও। এবার তার আর রূপশ্রীর ভেতরে সত্যি করেই গড়ে উঠবে একটা সীমানাহীন সমুদ্রের ব্যবধান। সেখানে আর কোনো সম্ভাবনাই নেই সেতুবন্ধনের। পার্ক সার্কাসেও নয়—ইয়োরোপে। সেখানে থেকে মাই-ক্রোস্কোপ্ দিয়েও আটান্তরের একের-এ-কে দেখা যাবেনা। ব্যাকটিরিয়া নয়—ভাইরাসের চাইতেও অণুতম অণু হয়ে হারিয়ে যাবে সে !

রূপশ্রীর দিকে চোখ তুলে স্বচ্ছ হাসি হাসল সে : শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

রূপশ্রী হাসলনা। একটা কথাও বললনা। একট স্তব্ধ অতলস্পর্শ মন

নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সেতুবন্ধ রইলনা—তবু আকাশে আকাশে একটা ছায়াপথ মেলা রইল ভবিষ্যতের জন্যে!

কিন্তু—রইল কি?

আটাত্তরের একের এ-র সামনে ভারী গোলমাল।

লাঠি হাতে সেই ভীমদর্শন কাবুলী—তার চারদিকে উত্তেজিত জনতা। তাকে মারবে। মানুষ খুন করে টাকা আদায় করতে চায় সে? ঘা কতক উত্তম-মধ্যম দিয়ে এবার তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে থানায়।

কাবুলী কিঞ্চিৎ বিপাকেই পড়ে গিয়েছিল—আরো ঘাবড়ে যাচ্ছিল গেরুয়াপরা সাধুর তর্জন দেখে।

—পিটায়কে চ্যাপ্‌টা করে দেগা! কেয়া, এ কাবুল পায়া হ্যায়? এ কলকাত্তা হ্যায়!

—হিঁয়া ওসব চালাকি চলবেনা! দশ বছর ঘানিমে ঘুরায় গা!

কিন্তু কাবুলীর ত্রাণকর্তার ভূমিকায় নেমেছেন জ্ঞানাঞ্জন।

—আহা, বুঝছেননা! ওরা হল গোঁয়ার মানুষ। একটু রাগ হলেই ওদের লাঠি চলে। নইলে আজ দশ বছর আমি কারবার করছি তো ওর সঙ্গে। এম্‌নিতে চমৎকার লোক আগা সাহেব!

—তাই অর হাতে প্রাণডা গেলেও পুণ্যি হইবো—নকুল ফোড়ন কাটল।

—অরে নোক্‌লা, চুপ করস্‌নি রে?—গোকুলবাবু ধমক দিলেন: অত কথা দিয়া তর্ কামডা কী?

জ্ঞানাঞ্জন বললেন, আহা-হা, আপনারা বুঝছেন না। মাথা ওদের এম্‌নিই গরম—

—না হয়ে উপায় আছে!—একজন অচেনা দর্শক বয়ান দিলে: একে তো জাব্বা-জোব্বা দশ বছরের মধ্যে খোলা হয়নি—স্নান দূরের কথা। তারপরে ওই হিংয়ের গন্ধ! মাথা গরমের দোষ কী আর!

জ্ঞানাঞ্জন প্রায় শান্তি স্থাপন করে আনছিলেন, হঠাৎ একটা সমবেত চিৎকার শোনা গেল:

"আগা,

মুরগী লে-কে ভাগা—"

বিদ্যুৎ বেগে ফিরে তাকালো কাবুলী। মুহূর্তে লাল টকটকে হয়ে উঠেছে মুখ। চোখে জিঘাংসা। সেই যাত্রাদলের ছেলেগুলো। মুখ চোখ শয়তানিতে উদ্ভাসিত।

"আগা

মুরগী লে-কে ভাগা—"

—খাজ্জা গাজ্জা ভজ্জু ভস্—এম্‌নি একটা উৎকট আওয়াজ বেরুল কাবুলীর গলা দিয়ে, অন্তত তাই মনে হল শুনতে। সম্ভবত ওটা কোনো নিদারুণ কাবুলী গালাগালি! তার পরেই সব কিছুর ওপর সমাপ্তি টেনে দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে কাবুলী ছেলেগুলোকে তাড়া করল। হৈ-হৈ করে ছুটল পেছনের লোকগুলো।

কনকেন্দু ভেতর দিকে পা বাড়ালো।

নিচের উঠোনের শ্যামাদাসের হোটেলের জন্যে এক রাশ পোনা মাছ কুটতে বসেছে চম্পাবতী। কনকেন্দুকে দেখেই চোখ নামিয়ে নিল। কাল রাত্রের সেই ঘটনা—সেই কুড়ি টাকার নোট—সেই কান্না—সবই যেন নিতান্ত মায়া ছাড়া আর কিছুই নয়! একটা মৃদু করুণা মনের মধ্যে বয়ে উল্‌টো 'দ'য়ের মতো সিঁড়িটা বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল কনকেন্দু। ওর টাকাটা কালই পাঠিয়ে দিতে হবে।

সারা শরীরে ব্যভিচারের স্বাক্ষর চম্পাবতীর—কোটরে বসা চোখ। তবু —তবু একটা হৃদয় আছে। তাকে অস্বীকার করা যায়না। রসেটির কবিতা মনে পড়ছে: জেনি।

"Of the same lump (as it is said)
For honour and dishonour made,
Two sistet vessels. Here is one,
It makes a goblin of the sun—"

চম্পাবতী। "Makes a goblin of the sun!" কিন্তু রূপশ্রী? সূর্যমুখী সে।

নিজের ঘরে এসে সোজা মাদুরটা বিছিয়ে লম্বা হয়ে পড়ল কনেকন্দু।

—খট্-খট্-ঘর্-ঘর্—

সেই সেলাইয়ের কল। শব্দটা মাথার মধ্যে একটা ডায়নামোর আওয়াজের মতো বাজছে। কোনো কথাই আর তার ভাবতে ইচ্ছে করছেনা—কারো কথাই না। কদিনের মাথা ধরাটা আজ স্পষ্ট জ্বরের রূপ নিচ্ছে। শিরশির করছে সারা শরীর। একবার নিজের নাড়ী ধরে পরীক্ষা করতে চাইল, হাঁ, জ্বরই হয়েছে একটু।

কিন্তু শুয়ে থাকলে আরো খারাপ লাগবে—হয়তো বেড়ে উঠবে জ্বরটা। গোটা কয়েক ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেটই নিয়ে আসা যাক বরং। ঠাণ্ডাই লেগেছে।

আবার উঠে পড়ল। চটি টেনে বেরুল বাইরে। একটু এগিয়েই একটা ড্রাগিস্ট্ আর কেমিস্টের দোকান। সেখানেও ছোটোখাটো একটা জটলা।

আর কে? সেই আগা সাহেব। আজকের সন্ধ্যার নাটকে দেখা যাচ্ছে এই লোকটিই নায়ক। প্রতিপক্ষ আছেন মদন শীল।

—একখানা শাল চেয়েছি বাকীতে। এটুকু বিশ্বাস হয়না?

কাবুলী ঘর্‌ঘরে গম্ভীর গলায় বললে, নেহি।

—নেই?—মদন শীল দাঁত খিঁচোতে চেষ্টা করলেন, মুখের গভীরে সেই অতলান্ত অন্ধকার। হিংস্র ক্রোধে বলে বসলেন: আজ বিশ্বাস করবি কেন! করতিস ত্রিশ বছর আগে এলে। তোর মতো গণ্ডা গণ্ডা কাবুলী তখন ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকত আমার দোরগোড়ায়—

সেই অতীত-স্মৃতি! বহুদিন আগে ফেল পড়া ব্যাঙ্কের চেক বই নিয়ে আত্মঘোষণার করুণতম চেষ্টা! পাশ কাটিয়ে দোকানে ঢুকল, ট্যাবলেট কিনে বেরিয়ে এল বাইরে। কাবুলী চলে গেছে, একাই দাঁড়িয়ে তখনো উত্তেজিত

বক্তৃতা দিচ্ছেন মদন শীল। কনকেন্দু সরে এল, ভাবতে লাগল যাবে কোন্ দিকে।

এমন সময় প্রাণতোষবাবু। কোত্থেকে প্রায় ছুটেই এলেন।

—আপনার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।—তাঁর গলার স্বর জড়ানো, প্রায়ান্ধকারেও উজ্জ্বল অস্বাভাবিক চোখ। মুখে একটা কিসের নিশ্চিত গন্ধ। কনকেন্দু দু' পা পিছিয়ে গেল চকিত হয়ে।

—একি—মদ খান নাকি আপনি?

—নেশা নেই—প্রাণতোষ তেমনি অল্প অল্প জড়ানো স্বরে বললেন, কালেভদ্রে কখনো এক আধটুকু কালী মার্কা খেয়েছি। আজ আর থাকতে পারলাম না কনকবাবু, মনে হল একটু না টানলে আমি বোধ হয় দম আটকেই মরে যাব।

—কী হল? এত উত্তেজনা কেন?

—দারুণ খবর আছে।

—বিহারী?

প্রাণতোষ মাথা নাড়লেন।

—বেশ, ঘরে চলুন। শোনা যাক।

—না, না, ঘরে নয়। খুব গোপনীয়। একটু গঙ্গার দিকেই হাঁটা যাক আসুন।

পা আর বইছেনা, মাথায় দেড়মণ ভার। তবু চলতে হল। একটা চাপা কৌতূহলও আছে। সত্যি সত্যিই আলাদীনের প্রদীপ প্রাণতোষবাবুর হাতে তুলে দিল নাকি বিহারী? একেবারে নগদ দশ হাজার টাকার বন্দোবস্ত?

—বলুন, কী হল।

প্রাণতোষবাবু ফিস্ ফিস্ করে বললেন, চমৎকার লোক বিহারীবাবু। সহজেই বিশ্বাস করলেন আমাকে। অবশ্য দুঃখও করলেন: দাঁওটা মামুকেই পাইয়ে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আপনি যখন এত করে বলছেন—আচ্ছা!

—তারপর?

—প্রায় বেলা দুটোর সময় পৌঁছুলুম শ্যাম স্কোয়ারে। আমাকে একটা

মেঝে বসিয়ে বিহারীবাবু তো চলে গেলেন। আমার যে তখন কী বুকের ধুকপুকুনি সে আর কী বলব! তা বসে আছি তো আছিই, কেউ আর আসেনা! শেষে যখন ঠাওরাচ্ছি, সব গাঁজা—উঠে পড়ব কিনা, হঠাৎ পেছনে কে কাঁধে হাত দিলে। ফিরে দেখি পাগড়ী মাথায় একটা হিন্দুস্থানী, তার গামছাটা খোলা, আর তার মধ্যে—হঠাৎ গলা ধরে গেল প্রাণতোষবাবুর, আর—আর বলতে পারলেন না।

—তার মধ্যে ?

—দুখানা একশো টাকার নোট আর দুটি গিনি। জাল নয়, একেবারে খাঁটি! দেখিয়েই লোকটা ঝাঁ করে সরে গেল।

—তারপর ?

প্রাণতোষবাবু একবার দম নিলেন। আবেগের সঙ্গে লড়াই করছেন প্রাণপণে: একটু পরেই বিহারীবাবু এলেন। বললেন, দেখলেন তো ? এই রকম দশ হাজার টাকার মাল ওর কাছে আছে। যদি পাঁচশো টাকা খরচ করতে পারেন, তা হলে সবই আপনার। এক ধাক্কাতেই বড় লোক হয়ে যাবেন মশাই।

হাঁটতে হাঁটতে দু-জনে গঙ্গার ধারে এসে পড়েছে। পোস্তার একটা অন্ধকার কোণায় তারা দাঁড়ালো।

আশ্চর্য, বিহারীকে সত্যিই সে ভুল বুঝেছিল নাকি ? এমন একটা দুর্লভ সুযোগ নিজে পেয়েও তুলে দিলে পরের হাতে ?

কনকেন্দু বললে, বেশ ইণ্টারেস্টিং। তারপর ?

প্রাণতোষবাবু হাঁপাতে লাগলেন: কালই ব্যবস্থা করে ফেললাম। মানে শুভস্য শীঘ্রং।

—অর্থাৎ ?

—কাল পাঁচশো টাকা নিয়ে আমি যাব ভবানী দত্ত লেনে, ঠিক ওয়াই-এম-সি-এর মুখোমুখি। ওঁরা ওখানে জিনিস নিয়ে আসবেন, আমি নিয়ে যাব টাকা। হাতে হাতেই ট্রানজাকশন হয়ে যাবে।

—ভালো করে ভেবে দেখবেন প্রাণতোষবাবু। বার বার আপনাকে

সাবধান হতে বলছি। সব ভালো করে খোঁজ নেবেন, দেখে নেবেন, কোনো গোলমাল আছে কিনা এর ভেতর।

—গোলমাল কোত্থেকে হবে? আরে, আমাকে অত কাঁচা ছেলে পেয়েছেন? প্রাণতোষবাবু বললেন, বেলা দেড়টার সময় হ্যারিসন রোড কলেজ স্ট্রীটের জংশনে চালাকি! পাঁচ সাত হাজার লোক চারদিকে! একটু জোচ্চুরি করলে আর পালাতে হচ্ছেনা!

—যা ভালো বোঝেন করুন। কিন্তু টাকার জোগাড় আছে তো আপনার?

—যোগাড় হয়ে যাবেই।—হঠাৎ প্রাণতোষবাবু গদ্‌গদ্‌ হয়ে উঠলেন: কনকবাবু, আপনি দেবতা। আপনার জন্যেই এত বড় সুযোগটা আমি পেয়ে গেলাম। যদি টাকা পাই, পাঁচশো টাকা প্রণামী দেব ব্রাহ্মণকে, অকৃতজ্ঞ আমি নই।

—টাকায় আমার দরকার নেই। আপনি পেলেই আমি খুশি হবো।

হাঁ হাঁ করে বাধা দেবার আগেই প্রাণতোষবাবু হঠাৎ নুয়ে পড়লেন, তুলে নিলেন পায়ের ধুলো। প্রায় কান্নাভরা স্বরে বললেন, একেই বলে ব্রাহ্মণ! একবিন্দু লোভ নেই শরীরে!

—আচ্ছা, পরে হবে ওসব। এখন চলুন—ফেরা যাক। শরীরটা ভালো নেই আমার।

ফিরতে ফিরতে কখন কনকেন্দুর চোখটা গিয়ে পড়ল চম্পাবতীর গলির দিকে, সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিটা থমকে গেল। গ্যাসের মিটমিটে আলোয় চম্পাবতীর ঘরের কড়া নাড়ছে কে চোরের মতো? কনকেন্দুকে দেখেই চট করে সরে গেল কে যেন একটা অন্ধকার দেওয়ালের ছায়ায়?

না, ভুল দেখেনি। সাধু। সেই পরম নিষ্ঠাবান সাধুই বটে! সাধুর জপ-তপের পুণ্য-প্রবাহে সেই কুড়ি টাকাও কি তবে পবিত্র হয়ে যায়নি?

প্রাণতোষবাবু বললেন, দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন? চলুন।

নয়

পরদিন সকালে আর বিছানা থেকে ওঠা গেলনা। সর্বাঙ্গে তীব্র জ্বরের বিদ্যুৎ চমক!

গোকুলবাবু মাথায় হাত দিয়ে চিন্তিত হয়ে উঠলেন: তাই তো কী করন যায়? অরে নোকলা, ডাক্তার ডাইকা আন্ একটা।

ক্লিষ্ট গলায় কনকেন্দু বললে, কিছু দরকার নেই—ইনফ্লুয়েঞ্জা। আপনিই ছেড়ে যাবে।

গোকুলবাবু তবু ছাড়লেন না। নকুলকে দিয়ে আবার ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট এনে খাওয়ালেন, তারপর বালির ব্যবস্থা করে দুই ভাই চলে গেলেন অফিসে। রাত্রির সেই ঘটনার পরে সুদাম কেমন লজ্জিত হয়ে আছে, দূর থেকে ডেকে বললে, জ্বর হয়েছে বুঝি? চুপ করে শুয়ে থাকুন।

বেড়ে চলল তপ্ত দুপুর। চারদিকে একটা অদ্ভুত শূন্যতা। যতীন পুতিতুণ্ডির রিক্ত জায়গার পাশে এখনো কয়েকটা লেবেল পড়ে আছে—গোকুল বাবু কি ইচ্ছে করেই ঝাঁট দিয়ে ফেলে দেননি ওদের? ট্রেনে কাটা পড়ল লোকটা, এক মুহূর্তে মুছে গেল পৃথিবী থেকে। একটা জুয়াচোর। ঘরে বিধবা মা, ক্ষুধিত ভাই-বোন, একটা যক্ষ্মাগ্রস্ত ভাই—

খট্ খট্—খর্ খর্—সেলাইয়ের কলটা চলছে। পচা মাড়ের অম্ল গন্ধের সঙ্গে মিশছে গাঙ্গুলীর ফুটন্ত ঘুগনির তপ্ত বাস। দূরে যাত্রার দলে ছোকরাদের ঘুঙুরের আওয়াজ আর গান কানে আসছে:

"প্রাণ পিয়ালা ভরা মধু,
পান করো হে রসিক বঁধু—"

রাস্তায় কে চিৎকার করছে? মদন শীল?

—যা-যা, বেশি চালিয়াতি করিসনি। কাপ্তানী কাকে বলে জানিস? কখনো রেশমী রুমালে বেঁধে পেলা দিয়েছিস বাঈজীকে?

অতীতের কলকাতা। বাবুতন্ত্রের শেষ অধ্যায়। ঝাড়-লণ্ঠন, বাগান-

বাড়ি, পুতুলের বিয়েয় লাখ টাকা খরচ—সারা ভারতের সেরা বাঈজীর মুজ্‌রো। স্বপ্নলোকের কাহিনী।

ছায়ার মতো কে চলে বেড়াচ্ছে ঘরে? কী খুঁজছে সে? সেই তিল তেলের লেবেলগুলো? একটা হ্যাণ্ডবিল? যতীন পুতিতুণ্ডি? হ্যাণ্ডবিলটা তো লেখা হয়নি। কিন্তু যতীন—যতীন কি এখনো মারা যায়নি?

জ্বরের ঘোরে কনকেন্দু স্বপ্ন দেখছিল, কে ডাকল: দাদা?

ভূপেন।

অভিভূতের মতো উঠে বসতে চেষ্টা করল: এসো—এসো—বসো।

—জ্বর হয়েছে দাদা? থাক থাক, ওঠবার দরকার নেই।—ভূপেন পাশে এসে বসল: একটা খবর দিতে এলাম। আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে। এখনি।

—মানে?

—চাকরী পেয়েছি।

—চাকরী পেয়েছ তো চলে যাচ্ছ কেন?

—ট্রাম কণ্ডাক্টারের কাজটাই নিলাম দাদা। কাকা তো রেগে আগুন! ভদ্রলোকের ছেলে—ম্যাট্রিক পাশ, আমি শেষকালে ওই সব উড়ে-মেড়ার চাকরী নিলাম! খাকি উর্দি পরে শেষে ট্রামের ঘণ্টি বাজাব! লোকে 'তুই তোকারি' করবে, বলবে, এই কণ্ডাক্টার, ইধার আও। অপমানে তাঁর মাথা নাকি মাটিতে লুটিয়ে গেছে—কাবলীওলার লাঠির চাইতের সেটা মারাত্মক শক্ ওঁর পক্ষে!

—কণ্ডাক্টারী?

ভূপেন হাসল: চমৎকার চাকরী দাদা! বিনা পয়সায় সারা কলকাতা ঘুরে বেড়াব, কোনোদিন টিকিট কিনতে লাগবেনা। না—ঠাট্টা নয় সত্যিই। অ্যাদ্দিন ধরে যাদের দূরের থেকে দেখেছি, তাদের স্বজাতি হয়ে যাব। বই পড়ে নয়—হাতে-কলমে চললাম ফাইটিং ফ্রন্টে। আশীর্বাদ করবেন দাদা!

কনকেন্দুর বিহ্বল চেতনা আরো বিমূঢ় হয়ে উঠল জ্বরের ঘোরে।

—কিন্তু কোথায় যাবে?

—ওদেরই মেসে। আর এক ধাপ তলায়। সেই ভালো দাদা। যেখানে আছি, সেখানে থাকা চলেনা। হয় ওপরে উঠতে হবে, নইলে নামতে হবে নিচে। কিন্তু এই আধমরা পিঁজরাপোলের জীবন আর নয়। আমি নিচেই নামলাম দাদা—সেখান থেকে ওপরে ওঠবার সাধনা করব। চলি তবে এখন—

—কিন্তু তোমার চৌদ্দ আনা পয়সা—

—প্রোলিটারিয়েটদের পক্ষ থেকে আপনাকে উপহার দিয়ে গেলাম বই দুটো। নমস্কার দাদা। মাঝে মাঝে খোঁজ নেব, তা ছাড়া।দেখা হবে ট্রামে—

ভূপেন চলে গেল।

আলো নিবে গেল—আটাত্তরের একের এ-র একমাত্র আলো! এখন সব একটি স্বরগ্রামে বাঁধা—আশা নেই, ভবিষ্যৎ নেই—কিছুই নেই। শুধু পুনরাবৃত্তি চলবে এর পরে। বজায় রইল জ্ঞানাঞ্জনবাবুর প্রেস্টিজ—এ বাড়ির পচনধরা মধ্যবিত্তের প্রেস্টিজ! ফাটকা বাজী করে—কাবুলীওলার লাঠি খেয়েও যে প্রেস্টিজের হানি হয়নি, তার সর্বনাশ করছিল ভূপেন! ভালোই হল—এইবার এই পিঁজরাপোল তার অখণ্ড মহিমা নিয়ে বিরাজ করতে পারবে! দেড়শো দুশো বছরের পুরোণো এই বাড়ি তার সব কিছু জীর্ণতা নিয়ে বেঁচে থাকবে আরো হাজার বছর—খোলার ভেতরে মুখ লুকিয়ে অনাদিকালের মহাস্থবির কচ্ছপ যেমন করে বাঁচে!

মাথার মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা। হঠাৎ কেমন অসহ্য বোধ হতে লাগল। চলে যেতে হবে—চলে যেতে হবে এ বাড়ি ছেড়ে। আর এখানে থাকা যায়না। সব যেন ফাঁকা হয়ে গেছে—কোথাও যেন এতটুকু দাঁড়াবার জায়গা নেই। সম্মুখে হা হা করছে নিরবলম্ব শূন্যতা।

ঘুম এসেছিল—অথবা জরের যন্ত্রণায় অচেতন হয়ে পড়েছিল মনে নেই। একটা আর্ত কান্নায় ঘরটা যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল।

—সর্বনাশ হয়েছে কনকবাবু—সর্বনাশ হয়েছে আমার!

প্রাণতোষবাবু পাগলের মতো মাথা কুটছেন!

—কী হল, কী হল আপনার?

—সর্বস্ব গেছে আমার, এখন আত্মহত্যা করতে হবে! কনকবাবু, আমার সর্বনাশ হল!

কনকেন্দু উঠে বসল। জ্বরতপ্ত হাতে চেপে ধরল প্রাণতোষবাবুর হাত: বলুন—বলুন, কী করেছে বিহারী?

মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে প্রাণতোষ সবটা বলে গেলেন।

ব্যবস্থা পাকাই করেছিল বিহারী। যথাসময়ে যথাস্থানে এসেও ছিল হিন্দুস্থানীটাকে নিয়ে। প্রাণতোষ দিলেন পাঁচশো টাকার তোড়া, টাকাটা গুণে নিয়ে বিহারী যখন হাতে গয়নার বাণ্ডিলটা তুলে দেবে, তখনই ঘটল ঘটনাটা।

হঠাৎ কোত্থেকে দুজন পাহারাওয়ালা এল এগিয়ে। খপ্ করে চেপে ধরল বিহারী আর হিন্দুস্থানীটার হাত। বল্লে চোট্টা হ্যায়, পাকড়ো—

প্রাণতোষবাবুর কিছু আর ভাববার সময় ছিলনা। চোরাই মালের কেনা-বেচা হচ্ছে—খবর পেয়ে গেছে পুলিস। আর সঙ্গে সঙ্গেই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন পশ্চিম দিকে। কিন্তু খানিক দূর ছুটেই তাঁর মনে হল, কেমন পাহারাওয়ালা? মাথায় পাগড়ী নেই—গায়ে উর্দি নেই—তবে—তবে?

আচমকা দাঁড়িয়ে পড়লেন। পা দুটো যেন পুঁতে গেল মাটির তলায়।

বুদ্ধি যখন ফিরে এল, তখন কোথাও কেউ নেই। বুদ্বুদের মতো সব মিলিয়ে গেছে জনস্রোতে। কয়েক মিনিটের এই নাটক চোখেও পড়েনি হ্যারিসন রোড-কলেজ স্ট্রীটের দু' হাজার লোকের। শুধু ওয়াই-এম-সি-এ রেস্তোরাঁর একজন বয় জিজ্ঞাসা করছে: কেয়া হুয়া বাবু, এতনা ছুটতা কেঁউ?

পুলিস? ডায়েরি?

কোন্ সাহসে যাবেন? চোরাই মাল কিনতে গিয়েছিলেন, তাঁকেই আগে গ্রেপ্তার করবে পুলিসে!

কনকেন্দুর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টির সামনে মেঝেতে মাথা ঠুকতে লাগলেন প্রাণতোষ-বাবু। কপাল ফেটে তখন ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত নামছে তাঁর।

—কী করছেন! ওকি করছেন আপনি?

—আমার সর্বনাশ হল কনকবাবু, আমার সর্বনাশ হল! খুন করব—সব শালাকে আমি খুন করব—আমি সকলের রক্ত দেখব!

আর সইতে পারলনা কনকেন্দু। আচ্ছন্নের মতো শুয়ে পড়ল, লেপটা টেনে নিলে মুখের ওপর। নিজের কান প্রাণপণে চেপে রইল দু' হাতে। তবু দূর-দূরান্তের থেকে যেন প্রাণতোষবাবুর গোঙানি ভেসে আসতে লাগল।

তারপর সারা দুপুর আর রাত জ্বরের ঘোরে সে অজ্ঞান হয়ে রইল। আবছা আবছা গলার স্বর কানে এল: গোকুলবাবু, নকুলবাবু, যোগদাবাবু, সুদাম? না - রূপশ্রী? কপালে কে হাত রাখল? কিছুই মনে নেই।

জাগল সে সকাল বেলায়।

পুলিস এসেছে আটাত্তরের একের-এ বাড়িতে। গ্রেপ্তার করতে এসেছে প্রাণতোষবাবুকে। অফিসের ক্যাশ থেকে টাকা ভেঙেছেন তিনি।

পুলিস! এই বাড়িতে পুলিস! মধুচক্রে ঢিল পড়েছে। চারদিকে ভয়ার্ত গুঞ্জন। রাস্তায় লোক জড়ো হয়ে গেছে। কাঁপতে কাঁপতে উঠে পড়ল কনকেন্দুও।

—কী হইবো কনকবাবু—কী হইবো?—সভয়ে জানতে চাইলেন গোকুলবাবু।

কী হবে! কনকেন্দু বলতে পারলনা।

কিন্তু কোথায় প্রাণতোষবাবু? কোথায় গেলেন তিনি?

পালাবার সাধ্য কী—শেষ পর্যন্ত পুলিসই আবিষ্কার করলে তাঁকে। ওদিকের একটা শূন্য ঘরের খিল ভেঙে ভেতরে ঢুকতেই পাওয়া গেল পলাতককে। কড়িকাঠের রিংয়ে ফাঁস দিয়ে ঝুলছেন প্রাণতোষ—ঘাড় মটকে গেছে, দেড়হাত বেরিয়ে আছে জিভটা, চোখ নাক আর ঠোঁটের কোণা থেকে গড়িয়ে আসা রক্ত কালো হয়ে জমে আছে বুকের ওপর!

অনেকের সঙ্গে সে দৃশ্যও দেখল কনকেন্দু। জ্বর-জর্জর চোখে দেখল প্রেতলোকের দুঃস্বপ্ন।

—আমার ইয়ং ওয়াইফ মশাই—তার সাধ-আহ্লাদ আছে—

অসুস্থ মাথার মধ্যে আগুনের চাকা ঘুরে গেল যেন। একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরুল গলা দিয়ে। তারপর মাটিতে টলে পড়ে গেল কনকেন্দু—পড়ে গেল গোকুলবাবুর পায়ের কাছেই।

জ্ঞান ফিরে আসছে—আস্তে আস্তে আবার পরিষ্কার হয়ে আসছে সব। স্মৃতিটা এখনো শিউরে শিউরে বেড়াচ্ছে ফাঁসির দড়িতে ঝুলন্ত প্রাণতোষবাবুর বীভৎস দেহটার ওপর। চাপা গোঙানি বেরিয়ে এল গলা দিয়ে।

দূর থেকে একটা অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর: কেমন বোধ কইর্‌তেছেন?

একবার ইচ্ছে হল চোখ মেলে তাকায়, কিন্তু সাহস হলনা। হয়তো আবার সেই বিভীষিকাটা দৃষ্টির সামনে চিৎকার করে উঠবে। সেই মট্‌কানো ঘাড়—ঝুলে পড়া জিভ, চোখ আর নাকের পাশ দিয়ে গড়িয়ে নামা রক্তের কালো ধারা—

চোখের পাতা দুটো প্রাণপণে চেপে ধরে কনকেন্দু জৈবিক গলায় গোঙিয়ে উঠল: চলে যাব—চলে যাব এখান থেকে। এ বাড়িতে আর এক মুহূর্তও আমি থাকতে পারবনা।

—কোথায় যাবেন? ঠিকানা বলুন—

আবার একটা অস্পষ্ট জিজ্ঞাসা। যেন একটা সুদূর সমুদ্রের ওপার থেকে ভেসে আসা স্বর।

বলতে যাচ্ছিল, পার্ক সার্কাস—আমির আলি অ্যাভিনিউ। বলতে যাচ্ছিল—আর কেউ নয়, শুধু একবার করুণ ক্লান্ত দৃষ্টি নিয়ে পাশে এসে দাঁড়াক রূপশ্রী। এই বীভৎস অন্ধকার থেকে—এই অপমৃত্যু থেকে এবার একরাশ শুভ্র জ্যোৎস্নার মধ্যে গিয়ে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলুক সে। রূপশ্রী দূরে চলে যাক—তবু তো থাকবে শঙ্করদার নিশ্চিন্ত আশ্রয়। আর নয়—এখানে আর নয়!

—চাঁদা করে সবাই ভিজিটের টাকা দিলেন, আমাকে একবার ডাকলেন না? গোটা চারেক টাকাও তো আমি দিতে পারতাম।

চাঁদা করে ভিজিটের টাকা! এবার সুদূর সমুদ্রের ওপার থেকে কারো স্বর নয়, যেন কে একটা প্রচণ্ড আঘাত করল তাকে। চমকে চোখ মেলল কনকেন্দু।

আকুল দৃষ্টিতে পায়ের কাছে বসে আছেন গোকুলবাবু। তাঁর পাশে নকুল—দু' চোখে তার নিবিড় উৎকণ্ঠা। ডালের কাঁটা হাতে উপস্থিত শ্যামাদাস—সাধু তাকে বলছে, চট করে আগে বার্লিটা এনে দাও উনুন থেকে—তোমার ডাল পরে হলেও চলবে! আর—

দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে মোক্ষদাবাবু। তিনি উত্তেজিত।

সাধুর কথায় বাধা দিয়ে সক্রোধে বললেন, মেসের কারুর বিপদ-আপদ হলে দায়টা সকলেরই। আমাদের মধ্যে এসে বিপদে পড়েছেন ভদ্রলোক, চাঁদা করে ডাক্তারের ভিজিট তুললেন আপনারা—আমাকে একবার খবরও দিলেন না?

সুদাম পাল হাসল: বেশ তো, আবার ডাকতে হলে সবটাই দেবেন।

—দেবই তো। আমি মোক্ষদা সরকারের ছেলে, সামাজিক দিকটাও আমরা দেখতে জানি!

সাধু বলল, যাও হে শ্যামাদাস, যাও,! চট করে বার্লিটা করে এনে দাও—

কনকেন্দুর বিহ্বল চোখ সকলের মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে যেতে লাগল। আটাত্তরের একের এ-র সমস্ত মানুষগুলো। মানুষ নয়—মানুষের ভগ্নাংশ।

মাথায় ঝিরি ঝিরি ঠাণ্ডা হাওয়া। একটি নিটোল ফর্সা হাতে পাখা চলেছে। চম্পাবতী ছাড়া আর কে? ঘোমটার আড়ালে তার মুখ দেখা যায়না—কিন্তু সে মুখ অনুভব করা যায়!

জ্ঞানাঞ্জনবাবুর গম্ভীর গলা এল: এখানে থাকলে তো কষ্টই হবে। কোথায় যেতে চান বললেন কনকবাবু? একটা ট্যাক্সি ডেকে বরং সেইখানেই পাঠিয়ে দেওয়া যাক আপনাকে।

আর একবার ঘরের সকলের ওপর দিয়ে বিহ্বল বিভ্রান্ত দৃষ্টি বুলিয়ে গেল কনকেন্দু। মানুষের ভগ্নাংশ নয়—সব মিলে একটা অখণ্ড সমগ্রতা।

বিশাল একটি বিপুল মাহুষ; অপঘাত আর অপমৃত্যুর শ্মশানে দাঁড়িয়ে আছে তার মহাকায় মূর্তি। অনেক যতীন পুত্তিতুণ্ডি আর প্রাণতোষবাবুর কঙ্কাল-ছড়ানো মাটির ওপর পা ফেলে সে তাকিয়ে আছে এক আশ্চর্য দিগন্তের দিকে। এখনো সেখানে ভোরের বর্ণরাগ উদ্ভাসিত হয়নি, কিন্তু তবু, তবুও অন্ধকার একটু একটু করে ধূসর হয়ে আসছে। আর—আর শুনেন তার প্রথম কল-কাকলি!

একটা নিশ্চিন্ত ঘুমের ঘোরে চোখের পাতা দুটো বন্ধ করে আনতে আনতে প্রায় স্বগতোক্তির মতো ফিস্‌ফিস্‌ করে কনকেন্দু বললে, যাবনা। এখান থেকে আমি কোথাও যাবনা।

কলিকাতা,

আশ্বিন, ১৩৫৯